নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (SMC) কি স্থগিত?

২০০৯ সালে শিক্ষার অধিকার আইন প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই বিদ্যালয় ব্যবস্থায় প্রাথমিক-বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি এবং এর দ্বারা নির্মিত ত্রি-বার্ষিকী পরিকল্পনা-ভাবনা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় চলে আসে। বিশেষত হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলি রাজ্যস্তরে আইন পাশ করিয়ে বিদ্যালয় ব্যবস্থার মধ্যে অভিভাবকদের ভূমিকা এবং কণ্ঠস্বরকে তাৎপর্য্য মণ্ডিত করে তুলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১২ সালের ১৬ই মার্চ রাজ্য নিয়ম প্রকাশ করার সময় বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোকপাত করে ছিল এবং ২০১২ সালের আগষ্ট মাসে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হলেও এখনও পর্যন্ত এনিয়ে প্রশাসনিক স্তরে সেরকম কোন পদক্ষেপ দেখা যায়নি। বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি এর প্রধান কারণ হল যে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির গঠনগত চরিত্র নিয়ে অনেকগুলি ভিন্নমত উঠে এসেছে।

তবে বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা কিরকম হতে পারে তাই নিয়ে আমরা নবদিশার এই সংখ্যাতেই যতটা সম্ভব সৃজনশীল ভাবে আলোচনা রাখলাম। পরিচালন সমিতির গঠনগত চরিত্র এবং বিন্যাস যাই হোক না কেন তার প্রধান কাজ হবে সৃজনশীল ভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা এবং তার গুনগত মানোন্নয়ন করা। যারা এই নিয়ে ভাবিত এবং অনুশীলনে ব্যাপৃত তাদের আরো মতামত এবং প্রতিবার্তা এই পরিকল্পনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

পঞ্চায়েত ও স্কুল শিক্ষা নিয়ে শুরুর চিন্তা - তৎকালীন উন্নয়ন পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী মনীশ গুপ্তের মতামত

স্কুলের গতানুগতিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করে দেওয়া যেতে পারে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষাও। তাতে এক দিকে যেমন আলাদা করে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ হওয়ার জন্য পড়ুয়াদের অন্য কোনও সংস্থায় ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হয় না, তেমনই অন্য দিকে, স্থানীয় প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে পড়ুয়ারা কারিগরি খুঁটিনাটিতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরির আগে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে যোজনা কমিশনের আলোচনা-চক্রে 'নাগরিক সমাজের প্রস্তাব' সংক্রান্ত কর্মশালায় এমনই মতামত দিলেন পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন-পরিকল্পনা মন্ত্রী মনীশ গুপ্ত। এখানেই শেষ নয়, শিক্ষাক্ষেত্রের পাশাপাশি সরকারের কাজের বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নেও মনীশবাবুর প্রস্তাব, "পঞ্চায়েত বা পুরসভা স্তরে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় প্রকল্প যেমন চলছে চলুক। তার পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলি এই সংস্থাগুলিকে বাড়তি অর্থ বরাদ্দ করতে পারে। যার মাধ্যমে স্থানীয় পঞ্চায়েত বা পুরসভা একেবারে তাদের নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিতে পারে।"

এ ভাবেই কী তবে পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থাকে আরও বিকেন্দ্রীকরণের পথে নিয়ে যেতে চাইছে পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার?

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ বুধবার ১ জুন ২০১১
আনন্দবাজার

নবদিশার শিক্ষা ভাবনায় এই বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত করা হয়েছে। স্থানীয় সম্পদ ও চাহিদার ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরের ছেলেমেয়েদের কারিগরি জ্ঞান হাতে কলমে প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে যদি সংযোজন করা যায় তাহলে ছেলেমেয়েদের আর চাকরীর উপরে হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে না স্থানীয় ভাবে সে কিছু কাজ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়ে উঠবে।

আশার আলো - এক আদর্শ বিদ্যালয়ের পথে

ভেলুরডাবরী বি এফ পি প্রাথমিক বিদ্যালয় – জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার ২ নং ব্লকের চাপড়েরপার ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত একটি স্কুল। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ মনে করেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি হল নিজেদের এক সংসার আর ছাত্র-ছাত্রীগণ হল তাদের সন্তান সন্ততি।

এই ভাবধারা থেকে নিজের সংসারের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে যে কর্মযজ্ঞ তারা শুরু করেছেন সেখানে প্রথম থেকেই তারা যুক্ত করে নিয়েছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, মাতা শিক্ষক কমিটি, ভি ই সি, শিক্ষা দপ্তর এবং সর্বোপরি গ্রামের জনসাধারণকে যাতে স্কুলটি হয়ে ওঠে সর্বসাধারণের স্কুল – গ্রামের স্কুল।

প্রথম ধাপ হিসাবে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে স্কুল পরিচালন সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে আলোচনা করে স্কুল প্রাঙ্গণের নিচু জমিটিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক সহায়তায় মাটি ফেলে উঁচু করে নিয়েছে। পরবর্তী ধাপে তারা সকলের সহযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের যুক্ত করে গড়ে তুলেছে রাসায়নিক বিষমুক্ত এক সুন্দর সব্জীবাগান, যেখান থেকে নানা ধরণের পুষ্টিগুণ সম্পন্ন সব্জী আসছে মিড ডে মিলের রান্নাঘরে। আবার এর পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহায়তায় ছাত্ররা শিখছে কোন সবজির কি গুণ, কখন কোনটা হয় প্রভৃতি বিষয়গুলি। বই খাতার নিরস বিষয়গুলি তাদের কাছে উঠে আসছে হাতে কলমে, আনন্দের মাধ্যমে হয়ে উঠছে এক সরস বিষয়।

পাশাপাশি স্কুলে তৈরি হয়েছে শিশু সংসদ যার মাধ্যমে ছোটবেলা থেকেই ছাত্র ছাত্রীরা শিখছে দায়িত্ব গ্রহণ করতে এবং এক আদর্শ পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের ধারণাও স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর হয়ে উঠছে। এই শিশু সংসদের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীরা নিজেরাই নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচন করছে প্রধানমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পরিবেশ মন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী ও সংস্কৃতি মন্ত্রীকে।

প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে চলা এই মন্ত্রীসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার সহযোগীদের নিয়ে দেখাশুনা করে কোন ছাত্র নখ কেটে আসে নি, কোন ছাত্রের চুল বড় বা অপরিচ্ছন্ন ভাবে স্কুলে আসছে প্রভৃতি বিষয়গুলি,

. . . এর পর ৬ পাতায়

বিপদসঙ্কুল সুন্দরবনে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার বার্তা

স্কুল ছাত্রী ও স্কুল ছুট কিশোরীদের ম্যানগ্রোভ নার্শারী

দক্ষিণ গোবিন্দকাটি, গোবিন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতাধীন আদিবাসী অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম একটি পিছিয়ে পড়া গ্রাম। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে গোবিন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাটি বিস্তীর্ণ, সুন্দরবনের দুলদুলি দ্বীপে অবস্থিত। কালিন্দী, রায়মঙ্গল ও অন্যান্য নদী এবং জঙ্গল দিয়ে ঘেরা দ্বীপাঞ্চলের মানুষ প্রতি নিয়তই প্রকৃতির ভাঙ্গা-গড়ার শিকার। কখনো নদীবাঁধ ভাঙন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল নষ্ট হয়ে তারা নিঃস্ব হয়েছে, আবার কখনো ঘরবাড়ী ভাসিয়ে তাদের গৃহহীন করেছে। বিগত ২০০৯ সালের ২৫ মে'র আয়লা নামক বিধ্বংসী ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দুই ২৪ পরগণার জঙ্গল লাগোয়া সুন্দরবন এলাকায় বেশকিছু মানুষের অকাল মৃত্যুর সাথে সাথে হাজার হাজার ঘরবাড়ী ও পশুপাখি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিধ্বংসী আয়লার পরে অনেক বেশি সংখ্যায় বউ, বাচ্চা, বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছেড়ে, কেউ কেউ বাচ্চাদের লেখা পড়াকে চিরতরে বিদায় দিয়ে সপরিবারে ভিনরাজ্যে পাড়ি জমিয়েছে। তবুও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার রোষে রুষ্ট না হয়ে প্রকৃতিকে আরও ভালো করে চিনতে ও বুঝতে শিখিয়েছে কিছু মানুষ এবং এরই মধ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করার সংকল্প নিয়ে এলাকার মহিলাদের সাথে এগিয়ে এসেছে আদিবাসী পরিবারের কিশোরী কনিকা ও সুস্মিতারা। তারা বড়দের থেকে জেনেছে যে, গর্জন গাছ মাটির তলায় বেশিমাত্রায় শিকড় ছড়িয়ে মাটিকে ধরে রাখে এবং বাইন গাছ ঘন ঝাকড়া হয়, ফলে প্রবল ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের গতিকে কমিয়ে দেয়। আর তাই দক্ষিণ গোবিন্দকাটির কনিকা (১৮), নবমী (১৪),জ্যোৎস্না (১৫), সীতা (১৪)ও সুস্মিতা (১২) গরীব আদিবাসী (মুণ্ডা) পরিবারের ৫ জন কিশোরী কার্যকরী দল গড়ে ম্যানগ্রোভ নার্সারীতে বাইন, পশু, সুন্দরী, গোলপাতা ইত্যাদি ২০০০ চারা তৈরি করেছে। কনিকা (৭ম শ্রেণী), সীতা (৮ম শ্রেণী) ও সুস্মিতা (৬ষ্ঠ শ্রেণী) এখনও

. . . এর পর ৬ পাতায়

নবদিশা পাঠকদের কাছে আহ্বান

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার খোঁজে শিক্ষক এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন তাঁদের চিন্তা – অভিজ্ঞতা বিনিময় করার মঞ্চ হল এই নবদিশা পত্রিকা।

আপনাদের মতামত, শিক্ষা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাধারণ পাঠক্রমের বাইরে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমরা আশা করি নবদিশা পত্রিকার মাধ্যমে বিনিময় হবে।

জানার জন্য, শেখার জন্য ও জানানোর জন্য।

- আসুন, পথিক হন।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
৫/১/২/জি কর্নফিল্ড রোড, কলিকাতা – ৭০০ ০১৯
টেলিফোন নং – ৯১-৩৩-৬৫২২১০৯৭

সম্পাদকীয়

স্কুল উন্নয়ন পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

পঞ্চায়েতকে আমরা দেখতে অভ্যস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কিন্তু মনে রাখতে হবে পঞ্চায়েত গ্রাম সমাজের স্বশাসনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান আর সেই হেতু স্কুলটা সমাজের বাহিরের প্রতিষ্ঠান নয় সমাজের সঙ্গে তার নিবিড় যোগ আছে। তাই স্কুলের উন্নয়ন পরিকল্পনায় যেমন স্কুলের শিক্ষক, গ্রাম শিক্ষা কমিটি, গ্রামের নানা পেশার মানুষ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি, ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকমণ্ডলী ইত্যাদিদের ভূমিকা আছে, তেমনই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সদস্যা, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতিরও একটা ভূমিকা আছে। কারণ স্থানীয় পরিকল্পনায় এদের অংশগ্রহণ খুব জরুরী।

আর স্কুল উন্নয়ন পরিকল্পনা মানে তো শুধু পরিকাঠামোগত অর্থাৎ ক্লাসঘর, টয়লেট, খেলারমাঠ নয় সেই পরিকল্পনায় থাকতে হবে গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের স্থানীয়ভাবে কি বিষয় শেখানোর আছে এবং কিভাবে শেখানোর দরকার অর্থাৎ শেখা ও শেখানোর বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় ভাবে যদি প্রাসঙ্গিক শিক্ষা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে দিতে চাই তাহলে স্কুল উন্নয়ন পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতের ভূমিকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ স্থানীয় ভাবে আমাদের গ্রামের সামাজিক প্রতিষ্ঠান গ্রাম পঞ্চায়েত। যা গ্রাম জীবনের সঙ্গে মিশে আছে।

গ্রামের অন্যান্য উন্নয়নে যেমন গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব আছে তেমনই শিক্ষাও উন্নয়নের একটা বড় সূচক তৈরি করে। গ্রামে স্থানীয় ভাবে ছেলেমেয়েরা স্কুলে কি শিখবে বা কি শেখানোর দরকার সেটা কে ঠিক করবে? যদি ধরা যায় ঠিক করবে সরকারী স্কুল দপ্তর তাহলে সেটা কি প্রাসঙ্গিক হবে? শহরের সঙ্গে গ্রামের জীবনযাত্রার অনেক তফাৎ। গ্রামীণ অঞ্চলের ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি, জীবন সম্পর্কে প্রত্যাশা, স্বপ্ন একরকম আর গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের চাহিদা, প্রত্যাশা, স্বপ্ন আরেকরকম। তাই প্রাথমিক স্কুল উন্নয়নের পরিকল্পনায় গ্রামের কাছের মানুষের প্রতিষ্ঠান, গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা থাকা দরকার। আজকে এই চিন্তার প্রতিফলন আমরা জাতীয় শিক্ষা পাঠ্যক্রম (২০০৫) এ দেখতে পেলেও আজ থেকে বহুবছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মশক্তি প্রবন্ধে বলেছেন " স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার আমাদের ঘরের কাছে পড়িয়া আছে । কেহ কাড়ে নাই এবং কোনদিন কাড়িতে পারে না। আমাদের গ্রামের, আমাদের পল্লির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের উন্নতি সমস্তই আমরা করিতে পারি যদি ইচ্ছা করি, এক হই, এর জন্য সরকারের দরকার নেই"। অন্যদিকে ভারতের সংবিধানের ২৪৩ জি, ধারার ৭৩ তম সংশোধনীতে দায়িত্ব দিয়ে ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতকে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক ন্যায়ের সাপেক্ষে পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য। ৭৩তম সংশোধনী ছাড়াও ৯৩তম সংবিধান সংশোধনীতে শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব সরকারের বিভিন্ন স্তরের ভাগ করে নেওয়ার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে । যেহেতু গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি স্থানীয় স্তরের ভূমিকা পালন করে থাকে তাই গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা, পঞ্চায়েতের অবশ্য কর্তব্যই হয়ে দাঁড়ায়। এটা বাঞ্ছনীয় স্থানীয় ভাবে পঞ্চায়েত শিক্ষার সুযোগ তৈরিতে এবং তার স্থানীয় ভাবে গুনমানের উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। শুধু তাই নয় স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে অর্থপূর্ণ ভাবে যুক্ত করা হবে এবং স্কুল পরিকল্পনার মধ্যে আনতে হবে।

পঞ্চায়েতের এই নিবিড় সংযোগ শিক্ষাকে আরও অনেক বেশি দায়বদ্ধ ও জনমুখী হয়ে উঠতে সহায়তা করবে। স্থানীয় সরকারের এই প্রতিনিয়ত যোগাযোগের ফলে এটা আশা করা যায় যে জনগোষ্ঠীকে তার শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের জন্য তথাকথিত উচ্চপর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের দিকে যেতে হবেনা। পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রিত পরিসরেই তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজন, পরিকল্পনা এবং প্রত্যাশা তারা জানাতে পারবে। শিক্ষা জিনিসটি জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। তার জন্য যান্ত্রিক নিয়মে শিক্ষা, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কারখানা ঘরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় না এসে যদি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আসে,তাহলে হয়তো আমাদের গ্রামীণ ছেলেমেয়েরা উওরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে যাওয়া জ্ঞানের একটা চর্চার সুযোগ পেতে পারে। স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করার দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

"কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনের একটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হতে হবে"।

-স্বামী বিবেকানন্দ (আমাদের শিক্ষার গ্রন্থের রচনা থেকে নেওয়া)

স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার আমাদের ঘরের কাছে পড়িয়া আছে – কেহ তাহা কাড়ে নাই এবং কোন দিন কাড়িতে পারে না। আমাদের গ্রামের, আমাদের পল্লিশিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের উন্নতি, সমস্তই আমরা নিজেরাই করিতে পারি, যদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই। এর গর্বমেন্টের চাপরাশ বুকে বাঁধিবার কোন দরকার নাই।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আত্মশক্তি/সফলতার সদুপায় (২য় খণ্ড ও ৫ম পৃষ্ঠায়)

জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫'এর প্রেক্ষিতে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা

অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মত জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫'এর প্রেক্ষিতে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান এর অংশগ্রহণ এবং নতুন সম্ভাবনা নিয়েও অনেক কিছু বলা হয়েছে, যেগুলি নিয়ে এখনো পর্যন্ত নীতি নির্ধারণের স্তরে খুব একটা আলোচনা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

শুধু মাত্র পালনীয় কর্তব্যের দিকেই যদি প্রধান জোরটা থাকত তবে এ নিয়ে এতো আলোচনার প্রয়োজন থাকত না। এখানে পঞ্চায়েতীরাজ এবং শিক্ষার সম্পর্কটিকে প্রথমবার নির্মোহ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বুঝতে চাওয়া হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে এই সম্পর্কের পরিসরে প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলি এবং তাদের চরিত্রগুলি কি ধরনের।

জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে পঞ্চায়েতের সমান্তরালে আমরা এমন অনেক প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন সম্প্রসারিত করে চলেছি যেগুলির সাথে পঞ্চায়েতের সম্পর্ক এবং তাদের পারস্পারিক দায়বদ্ধতা একেবারেই স্থিরীকৃত নয়। সেজন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেখানে সম্মিলিত উদ্যোগের সম্ভাবনা খোলা আছে, সেখানে ভালো ভাবে তাৎপর্য মণ্ডিত উদ্যোগ গ্রহণে অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫, খুব তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বলেছে ব্লক এবং জেলা স্তরে সুপ্রচুর তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার ওপরে সরকার বিশেষ নজর দিয়েছে এবং এগুলির মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষার পরিমানগত মূল্যায়নের ওপরে গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। রূপরেখা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আরো বলেছে B.R.C/C.R.C গুলির পরিচালন এবং কার্যসম্পাদনের পদ্ধতি নিয়ে অনেক কিছু নতুন চিন্তা করার আছে। এখানে রূপরেখা খুব জোর দিয়েছে এইসব সম্পদ কেন্দ্রগুলোর কর্মীদের ভূমিকা নিরূপন করার ওপরে। এইসব সম্পদ কেন্দ্রগুলির কর্মীদের যদি আরো সক্ষম করে তোলা যায় তবে তারা শুধু বিদ্যালয় ব্যবস্থা নয় বরঞ্চ সামগ্রীক ভাবে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন শিক্ষাব্যবস্থার গুনগত মানোন্নয়নে।

রূপরেখা জানিয়েছে শিক্ষাদানের কাজে শিক্ষকদের স্কুলভিত্তিক সহায়তা আরো জোরদার করার জন্য গ্রাম, ব্লক, ক্লাস্টার এমনকি শহরতলীতে যারা তথ্য সরবরাহ করতে পারেন এমন ব্যক্তিদের তালিকা তৈরী করা খুব প্রয়োজন। নবদিশা এই কাজে ইতিমধ্যে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছে। রূপরেখা পরামর্শ প্রদান করেছে এই সব লোকেরা যাতে নিয়মিত নতুন নতুন তথ্য সম্প্রসারন করে পাঠদানে নতুন সৃজনের মাত্রা সংযোজন করতে পারেন তার দিকে নজর দিতে হবে এবং সর্বোপরি রূপরেখা বিশেষ ভাবে পরামর্শ প্রদান করেছে এই সহযোগিতাকে ব্লক এবং ক্লাস্টার পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য। এই প্রাতিষ্ঠানিক সমীকরণ একবার ঘটিয়ে দিতে পারলে এরজন্য অর্থ বরাদ্দ সম্ভব হবে।

নবদিশা এই সব নীতি মাঠ - স্তরে সম্প্রসারণে দায়বদ্ধ।

শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান এর ভূমিকা

বহুজাতিক গণমাধ্যম শাসিত শহরবাসী মননে পঞ্চায়েতের উন্নয়নের উদ্যোগগুলি সম্পর্কে একধরনের ভয়াবহ নেতিবাচক মনোভাব বিদ্যমান। যদিও এর সবটাই মিথ্যা এমন নয়। তবু আজও ভারতের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার আইনের প্রয়োগের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির নির্ণায়ক ভূমিকা সামনে চলে এসেছে। এ বিষয়ে শিক্ষার অধিকার আইন একগুচ্ছ দায়িত্ব আইনি ভাবে পঞ্চায়েতের ওপর আরোপ করেছে, যা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই আইনের ৯ নং ধারায় সুবিস্তৃত এবং সহজে অধিগম্য আকারে বর্ণনা করা হয়েছে যে,

প্রথমত: পঞ্চায়েতের হাতে দায়িত্ব থাকছে এলাকার সমস্ত ৬-১৪ পর্যন্ত শিশুকে শিক্ষা প্রদান করার। এখানে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল বিদ্যালয় ছুট বালক-বালিকাদের চিহ্নিত করা এবং তাদের স্কুলে অন্তর্ভুক্ত করা।

দ্বিতীয়ত: পঞ্চায়েতকে এই আইনের ৬ নং ধারা অনুসারে Neighbourhood School এর বন্দোবস্ত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে যে অধিনিয়ম করা হয়েছে সেখানে বিস্তারিত ভাবে অনুপুঙ্খগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার প্রাথমিকের জন্য ১ কিলোমিটার এবং উচ্চ প্রাথমিক এর জন্য ২ কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবেন এবং এই বিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়াতে পঞ্চায়েতের সবিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

তৃতীয়ত: পঞ্চায়েতকে সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় এবং অর্থনৈতিক ভাবে অনুন্নত শ্রেণীগুলি থেকে আসা শিশুরা কোনও বৈষম্যের মুখোমুখি না হন এবং এখানে তাদের বিশেষ ভাবে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার ওপরে নজর রাখতে এই আইন নির্দেশ দিয়েছে।

চতুর্থত: পঞ্চায়েতের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এলাকার ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুর বিষয়ে তথ্য রাখার। শুধু তাই নয় পাশাপাশি তাদের হাতে এই দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে যে এই সব শিশুদের বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তি উপস্থিতি এবং সুস্থ বিদ্যাচর্চার ওপরে পুরো নজর রাখার।

পঞ্চমত: বিদ্যালয় ভবন, শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষণের উপাদানের মতো বিষয়গুলির দায়িত্বও পঞ্চায়েতের ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে।

ষষ্ঠত: পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচীর সময়োপযোগী প্রস্তাবনাও স্থানীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষ দায়িত্ব।

সপ্তমতঃ শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের সুবন্দোবস্ত করা, বিদ্যালয় কি ভাবে চলছে তার দিকে সুনিপুণ ভাবে নজর দেওয়া এবং সর্বোপরি জীবিকার অনুসন্ধানে যেসব গ্রামীণ পরিবারগুলিকে বার বার স্থানান্তরিত হতে হয় তাদের শিশুদের শিক্ষায় যাতে কোনও ছেদ না পড়ে তার ওপরে দৃষ্টি দেওয়া পঞ্চায়েতের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

■■

বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনার (SCHOOL DEVELOPMENT PLAN) একটি সংকলিত কিছু সম্ভাব্য খসড়া

(১) মালতীবালা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়'এর বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি সার্বিক আলোচনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে আগামী তিনবছরে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়াদের নিয়ে তাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বন বা জঙ্গল আছে সেখানে গিয়ে তা দেখা নানা রকম পশুপাখি, গাছপালা, পতঙ্গ চেনার ব্যবস্থা করা হবে। তারজন্য দুই জন শিক্ষক মহাশয় ও স্থানীয় জ্ঞানী ব্যক্তি যারা জঙ্গলের গাছপালা, পশুপাখি চেনে তাদেরকে বিদ্যালয়ে যুক্ত করা, যাতে ছাত্রছাত্রীরা আরো ভালো করে শিখতে পারে তার দায়িত্ব দেওয়া হবে।

(২) মালতীবালা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা চাষবাসে যথেষ্ট খ্যাতি আছে। আমাদের এই পঞ্চায়েতে এখনো চাষী ভাইয়েরা ধরে রেখেছেন তাদের পরম্পরাগত চাষ পদ্ধতি, এখনো এই গ্রাম পঞ্চায়েতে পুরোনো বীজ অনেক চাষী ধরে রাখেন এবং সেগুলো পরিবারের খাবার জন্য ব্যবহার করেন। এই অভ্যাস যাতে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং পুরানো দেশীয়-বীজের চাষে এই গ্রাম পঞ্চায়েত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে, তার জন্য আমরা প্রস্তাব রাখছি পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের এই সব চাষী ভাইদের শস্য ক্ষেতে নিয়মিত পরিদর্শন করতে নিয়ে যাওয়া হোক। যাতে প্রাকৃতিক দেশীবীজের, রাসায়নিক সার , বিষের পরিবর্তে জৈবিক পদ্ধতিতে চাষবাসের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। তবে আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের সমস্ত পরীক্ষা-নীরিক্ষা গুলি তারা যাতে বুঝতে পারে তার জন্য জেলা KVK র সাথে যোগাযোগ তৈরি করা হবে। এই কাজে মালতীবালা গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষি এবং প্রাণীসম্পদ বিষয়ক উপসমিতিকে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করে তোলা হবে। এর মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোরদের স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থার সুস্থায়ী উন্নয়নে পঞ্চায়েত এর কী ভূমিকা হতে পারে সে প্রসঙ্গে খুব ভালো ধারনা সৃষ্টি হবে এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা আশা করি এই সব ছাত্রী-ছাত্ররা যখন স্কুল জীবন শেষ করে ব্যবহারিক জীবনে প্রবেশ করবে তখন তারা তাদের সুচিন্তিত, মতামত দিয়ে পুরো প্রক্রিয়াটিকে আরো সমৃদ্ধ এবং সচল করে তুলতে পারবে।

(৩) মালতীবালা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৩২টি পুকুর রয়েছে তার-মধ্যে আমাদের সমীক্ষা অনুযায়ী প্রায় ৩০-৩৫ রকমের দেশীয় মাছের প্রজাতি রয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সব মাছগুলি স্থানীয় মানুষদের জন্য খুব প্রয়োজনীয় এবং জরুরি পুষ্টির উৎস ও পাশাপাশি জীবিকার একটি প্রধান অবলম্বন। বিভিন্ন কারনে এই মৎস সম্পদ খুব দ্রুত ক্ষয় পেয়ে চলেছে। এলাকার দুই জন অভিজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমরা চিহ্নিত করেছি যারা এই ক্ষয় প্রক্রিয়া প্রতিরোধে খুব কাজ করছেন। তারা যাতে এলাকার মৎসসম্পদের নিবিড়তা এবং তার বৈচিত্রের সুস্থায়ীত্ব-সংরক্ষণে পড়ুয়াদের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধির সম্প্রসারণ-ঘটাতে পারেন তার জন্য বিশেষ ভাবে সুযোগ এবং পরিসর দেওয়া হবে। দীর্ঘ সময়ের ছুটিগুলিতে ছাত্রদের নিয়ে পুকুরগুলির অবস্থা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলা, দেশীয় প্রজাতির মাছের পুষ্টির গুণাগুণ ইত্যাদি বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হবে।

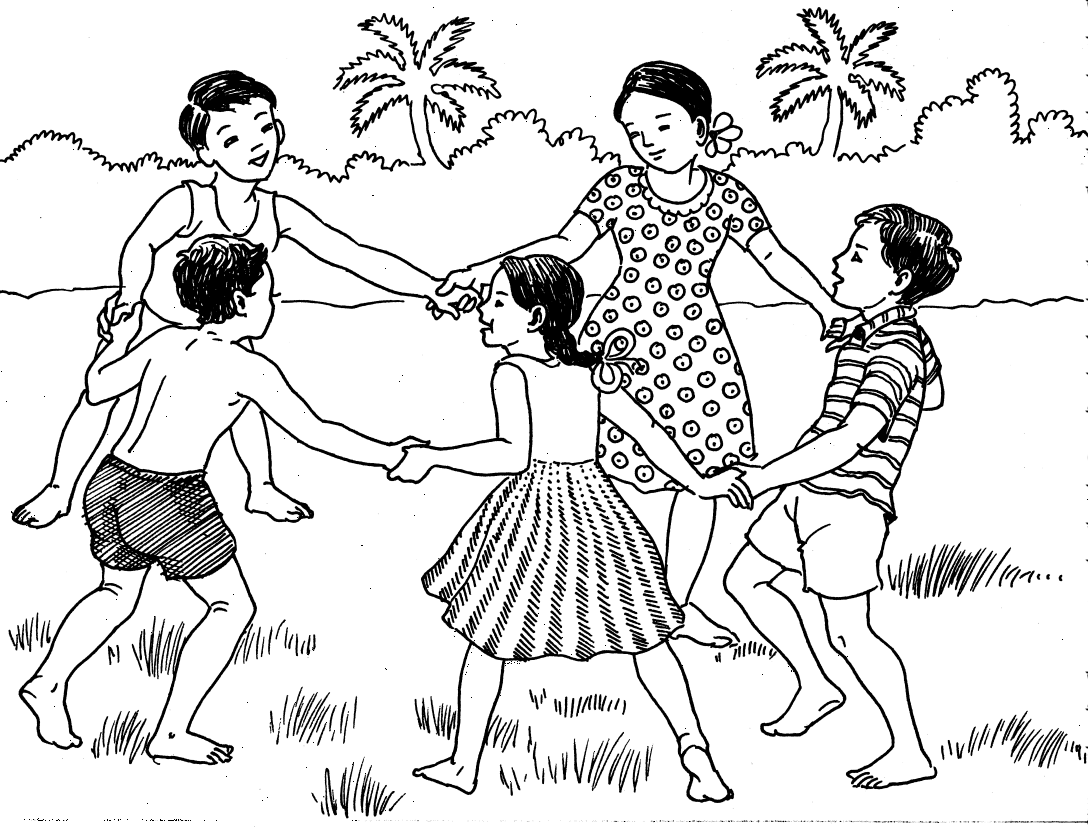

(৪) মালতীবালা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেড় কিমি দক্ষিণে প্রায় ছয় কিমি ব্যাপী প্রাচীন শাল অরণ্য এবং কৃষির সমান্তরালে অনেক শিশুর পিতা মাতা শালপাতা সংগ্রহ করার সাথেও যুক্ত। দারিদ্র এবং অন্যান্য অসচেতনতার কারনে এই সমৃদ্ধ শালবনের ঘনত্ব কমে যাচ্ছে। আমরা প্রস্তাব রাখছি স্থানীয় অরণ্য প্রশাসন বিভাগের কর্তা ব্যক্তিরদের সাথে সুস্থায়ী যোগাযোগ গড়ে তুলতে এবং মাঝে মাঝে কি ভাবে অরণ্য সংরক্ষণ এবং তার সুস্থায়ী ব্যবহার করতে হয় তার সম্পর্কে শৈশব থেকেই চেতনার সম্প্রসারণ করতে তাদেরকে বিদ্যালয়ে আসতে এবং চেতনা শিবির করতে অনুরোধ করা হোক। যেখানে স্থানীয় বন সুরক্ষা সমিতি বা EDC এবং যেসব অভিভাবকেরা অরন্যে যান তাদের অংশগ্রহণ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হোক।

(৫) মালতীবালা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যেই রয়েছে ২৫০ বছরের প্রাচীন নাট মন্দির। কথিত আছে এখানে তরুণ রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় অঞ্চলে তাদের জমিদারী পরিদর্শনের সময় বহুবার এখানে এসেছেন এবং এই অঞ্চলে প্রাচীন রাজ পরিবারের অনেক ভালো কাজের ছবি আছে সেগুলি যা ইতিহাসের সাক্ষ বহন করেন। এগুলির সংরক্ষণে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিচ্ছিন্ন ভাবে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে একথা সত্য, তবে যাতে এই স্থানীয় ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের বিষয় প্রতিমাগুলির সংরক্ষণ-এর মানোন্নয়নে নতুন প্রজন্ম আরো উৎসাহী এবং উদ্যোগী হয় তার জন্য আমরা প্রস্তাব রাখছি, বিদ্যালয়ের ইতিহাস – শিক্ষক মহাশয়কে মাঝে মাঝে এই সব স্থান পরিদর্শনে ছাত্রী-ছাত্রদের নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হোক।

(৬) বিদ্যালয়ের ৯০% - ৯৫% পড়ুয়া কৃষক পরিবারের সন্তান এবং যেহেতু এলাকার কৃষি নানা সংকটের মধ্যে আছে। সেই জন্য আমরা মনে করছি আধুনিক প্রজন্মকে, অর্থাৎ আমরা যার একাংশকে বিদ্যালয়ে পাচ্ছি, কৃষিমনস্ক করে তোলার সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হোক এবং এর জন্য বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৩ কাঠা জমির ওপরে আমরা পুষ্টি – বাগান তৈরির প্রস্তাব করছি। যার পূর্ণ দায়িত্বে থাকবে সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়ারা এবং সহযোগিতা করবে নীচু শ্রেণীর পড়ুয়া দল। এই পুষ্টি বাগানের ব্যবহার করার জন্য আমরা বাগানের পাশেই দুটি সুবৃহৎ জৈব সারের চৌবাচ্চা তৈরি করার প্রস্তাব রাখছি। এই পঞ্চায়েত এলাকায় কমপক্ষে ৫০ -৬০ টি পরিবার রয়েছে, যারা খুব দক্ষতার সাথে জৈবসার তৈরী এবং পারদর্শীতার সাথে তার ব্যবহার করে আসছেন। তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন অভিজ্ঞ চাষী ভাইকে বেছে নিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হোক বা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জৈব সার তৈরি পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনা পড়ুয়াদের শেখাবার জন্য। এই পুষ্টি বাগানে শাক-চাষ এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। এলাকাতে যারা শাক-চাষে পারদর্শী এবং বিভিন্ন শাকের পৌষ্টিক গুণাগুণ প্রসঙ্গে যাদের খুব স্পষ্ট ধারনা আছে এরকম তিনজন কৃষকের সাথে আমরা বিদ্যালয়ের বাগান পরিচালনায় যুক্ত পড়ুয়া দলকে সংযুক্ত করার প্রস্তাব রাখছি। যারা পড়ুয়াদের এই চাষ সুস্থায়ী ভাবে করার পদ্ধতি প্রসঙ্গে প্রশিক্ষিত করবে। তবে শুধু মাত্র সংসদ এলাকার বা গ্রাম পঞ্চায়েত এর কৃষকরাই নয় আমরা এই প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে যোগাযোগ এবং দফায় দফায় আলোচনা করেছি জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সাথে এবং তারা পরিপূর্ণ ভাবে আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, যে আমরা যদি ১২-১৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের তাদের খামারে নিয়ে যাই, তবে তারা আমাদের নিরীক্ষাকেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখাবেন এবং সহজভাবে ছাত্রী-ছাত্রদের সামনে তা বুঝিয়ে বলবেন। এজন্য আমরা প্রস্তাব করছি যেহেতু এখান থেকে ৪০-৪৫ মিনিটে জেলা সদরের KVK তে পৌঁছে যাওয়া যায়, তাই যারা জীবনবিজ্ঞানের মতো বিষয়ে একটু অগ্রনী ছাত্র হিসাবে চিহ্নিত তাদের এই শিক্ষাভ্রমণে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

(৭) আমাদের মালতীবালা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব ভবনের দোতলায় আছে সুদৃশ্য একটি অডিটোরিয়াম যেখানে অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন এবং অনুশীলন করার মতো জায়গা আছে। মালতীবালা গ্রাম পঞ্চায়েতেই রয়েছে খুব পরিচিত দুখানি নাটকের দল যারা শিশু নাট্য ভাবনায় জেলা রাজ্য স্তরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটাতে পেরেছে। আমাদের চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেনীতে এমন অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা খুব ভালো ভাবে নাটকসহ অন্যান্য প্রদর্শনমূলক শিল্পে দক্ষতা অর্জন করার মতো জায়গায় রয়েছে। আমরা তাই দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যদি এই সব শিক্ষার্থীদের এখান থেকেই নাট্যশিল্পের রক্ত মাংসের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া যায়, তবে অদূর ভবিষ্যতে তারা বৃহত্তর প্রেক্ষিতে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারবে। সেজন্য আমরা প্রস্তাব রাখছি এই দুখানি নাট্যদলের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করা হোক যাতে তারা বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত করতে পারে।

(৮) আমাদের এলাকায় যেসমস্ত লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য আছে সেগুলি আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। অভিজ্ঞ জ্ঞানী লোকশিল্পীও আছেন যাদেরকে ব্যবহার করে বিদ্যালয়ের চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের সপ্তাহে একদিন দু'ঘন্টার জন্য চর্চা ও শেখানোর ব্যবস্থা করা যায়। তাহলে তাদের মাধ্যমে এলাকার কিছুটা হলেও লোকশিল্পের ক্ষয়রোধ করা সম্ভব হতে পারে। সেই জন্য প্রস্তাব রাখছি অভিজ্ঞ শিল্পীকে বিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত করা হোক।

(৯) প্রধানতঃ দরিদ্র পরিবারের সন্তান হিসাবে আমাদের বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা অপুষ্টির শিকার এবং যার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসেবে তাদের রোগ প্রতিরোধের নিজস্ব ক্ষমতার ঘাটতি দেখা যায়। আমরা তাই দৃঢ় ভাবে প্রস্তাব রাখছি প্রতি ১৫ দিনে বিদ্যালয়ে একবার স্বাস্থ্য-শিবির করা হোক কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যাতে তা কোনো সময় সর্ব শিক্ষা অভিযান এর অন্তর্গত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণকে এড়িয়ে না যায় এবং দূর্বল না করে এবং স্থানীয় ব্লক স্তরের সাহায্যে এটা করা হবে।

(১০)আমরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চিহ্নিত করেছি প্রায় পৌনে ৩ কাঠা মতো জায়গা যেখানে গড়ে তোলা হবে প্রধানতঃ ফল, কাঠের এবং সবজি নার্সারী। এখানে উৎপাদিত চারা আমরা যেমন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রোপণ করবো তেমন ভাবে তা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে সেখানে লাগানোর জন্য। উৎসাহী শিক্ষার্থীরা পুরো প্রক্রিয়াটি খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষন করার মধ্য দিয়ে আমরা আশা করি তারা বুঝতে পারবেন কিভাবে একটি সুস্থায়ী, সুপরিকল্পিত এবং বাণিজ্য সফল নার্সারী সৃষ্টি করা সম্ভব।

(১১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যেসব জমি বছরের বেশীর ভাগ সময় প্রায় অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকে, আমরা প্রস্তাব করছি এই রকম ৪-৫ বিঘা জমি চিহ্নিত করে সেখানে পুরোপুরি দেশী বীজে সুস্থায়ী পদ্ধতিতে ধান চাষ এর উদ্যোগ নেওয়া হোক। শুধু উৎপাদনের জন্য উৎপাদন নয়, যাতে একটু উঁচু শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পুরো উৎপাদন চক্রটি ভালোভাবে বুঝতে পারে তার জন্য তাদের নিয়ে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করা হোক।

শিক্ষায় নবদিশা নিয়ে কয়েকটি কথা

- গ্রাম বাংলার শিক্ষাঙ্গনে, প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে আঞ্চলিক জীবনযাপন নির্ভর শিক্ষার নবসংযোজনের প্রচেষ্টা।
- আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতিই হবে সংযোজিত শিক্ষার মূল ভিত্তি।
- সাধারণ মানুষের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সরকার এর বাস্তব রূপায়নে সক্ষম হবে।

শিক্ষা শব্দটা দুটো অক্ষর দিয়ে তৈরী হলেও এর ব্যপ্তি বিশাল। মানুষ এর প্রয়োজনীয়তা নিজের মতো করেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। আর এই ব্যাখ্যাটাকেই নবদিশা মনে করে সঠিক অথবা হওয়া উচিৎ। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখনও পর্যন্ত অন্ন,বস্ত্র এবং বাসস্থানের সাথে সমান করে দেখতে সাধারন মানুষ অভ্যস্ত না হলেও এর বিশালতা নিয়ে বিদ্বদজন মহলে আলোচনা আজ সুদূর প্রসারিত।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি এই শব্দদুটো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আসলে শিক্ষার ধারণাকে যদি শুধু পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখি তাহলে এর বিশালতাকে ছোটো করে দেখা হবে। আজ প্রয়োজন এর প্রচার ও প্রসার ঘটানোর এবং যথাযথ প্রয়োগের। স্বাধীনতাপূর্বকাল থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি যে ইংরেজদের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল তা লর্ড ম্যাকলে সাহেবের সেই সময়ের বক্তৃতা থেকেই জানতে পারা যায়। তিনি বলেন " ...এই দেশের আত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা তাদের মেরুদন্ড,তাকে নষ্ট না করতে পারলে আমার মনে হয় আমরা কখনই এই দেশ জয় করতে পারব না। এজন্য আমি প্রস্তাব করছি যে, আমাদের তাদের প্রাচীন এবং ঐতিহ্যশালী শিক্ষাব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির পরিবর্তে এমন কিছু করা দরকার যাতে তারা ভাবে যে যা কিছু বিদেশী এবং ইংরাজী তাই ভাল ও উন্নত। এর ফলে তারা তাদের আত্মসম্মান এবং তাদের দেশীয় সংস্কৃতি হারাবে এবং পরিণত হবে সর্বতোভাবে এক পরাধীন জাতিতে ঠিক যেমন আমাদের প্রয়োজন।

সেই সময়ে ম্যাকলে সাহেব যা বলেছিলেন তার সরকার তা কাজে করেও দেখাতে পেরেছে। আর স্বাধীনতা উত্তরকালে সেই ফলাফলেরই নিদর্শন আমরা বিভিন্নভাবে দেখতে পাই। যেমন - গ্রামীন শিক্ষার বিষয়বস্তু রয়ে গেল শহরকেন্দ্রীক এবং পশ্চিমী ধাঁচের কিশোর ও যুব সমাজ স্থানীয় ঐতিহ্যশালী জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল গ্রামীন হতাশ যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি-যারা নিজেদের সমাজেও জায়গা পায় না, আবার শহরের চাকরির প্রতিযোগীতার জন্য অনুপযুক্ত সম্প্রদায়গুলি তাদের পরিচিতি হারিয়ে বঞ্চনা দারিদ্র এবং প্রান্তিকতার স্বীকার হতে থাকে

এহেন পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কিছু বিচ্ছিন্ন সংশোধনমূলক প্রচেষ্টা নেওয়া হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোলোঃ

- সর্ব শিক্ষা অভিযান
- ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকলের জন্য বাধ্যতামূলক ও বিনা পয়সায় শিক্ষা – শিক্ষার অধিকার আইন কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দ্বারা বিকল্প স্কুল চালানোর উদ্যোগ-রাজ্যস্তরে পশ্চিমবঙ্গ বৃত্তিমূলক বোর্ড গঠিত হয় যেখানে স্কুলছুটদের জন্য কিছু বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম তৈরী শহর ও গ্রামের মধ্যেকার বৈষম্য কোন সামাজিক অবস্থাতেই নতুন কোন ঘটনা নয়। যার ফলে কিছু ত্রুটি সবসময়েই লক্ষ্য করা যায়। উপরে লিখিত প্রায় সব ক'টি ব্যবস্থাই শহরের দিকে তাকিয়েই চালু হোল। যদিও সর্ব শিক্ষাকে অভিযান এর থেকে কিছুটা হলেও আলাদা কিন্তু গ্রামে সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নজরদারি করাটা খুব প্রয়োজন,কিন্তু তার যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। কিন্তু শহরকেন্দ্রীক শহরকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাব্যবস্থা যা গ্রামের গরীব পরিবারের যুব সম্প্রদায় গ্রহণ করে থাকে তা গ্রামীন প্রয়োজনীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার তুলনায় অপ্রচলিত ফলে সমগ্র গ্রামীণ সম্প্রদায়কে দুর্বল করে দেয়। একই সাথে গ্রামীন সংস্কৃতির বিকাশ হওয়ার বদলে ক্রমে তা বিলুপ্ত হওয়ার পথে। এর ফলে নিজস্বতা হারানো মানুষেরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে নিজেদের সংস্কৃতি হারিয়ে মানসিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়ে।

এহেন পরিস্থিতিতে নবদিশা

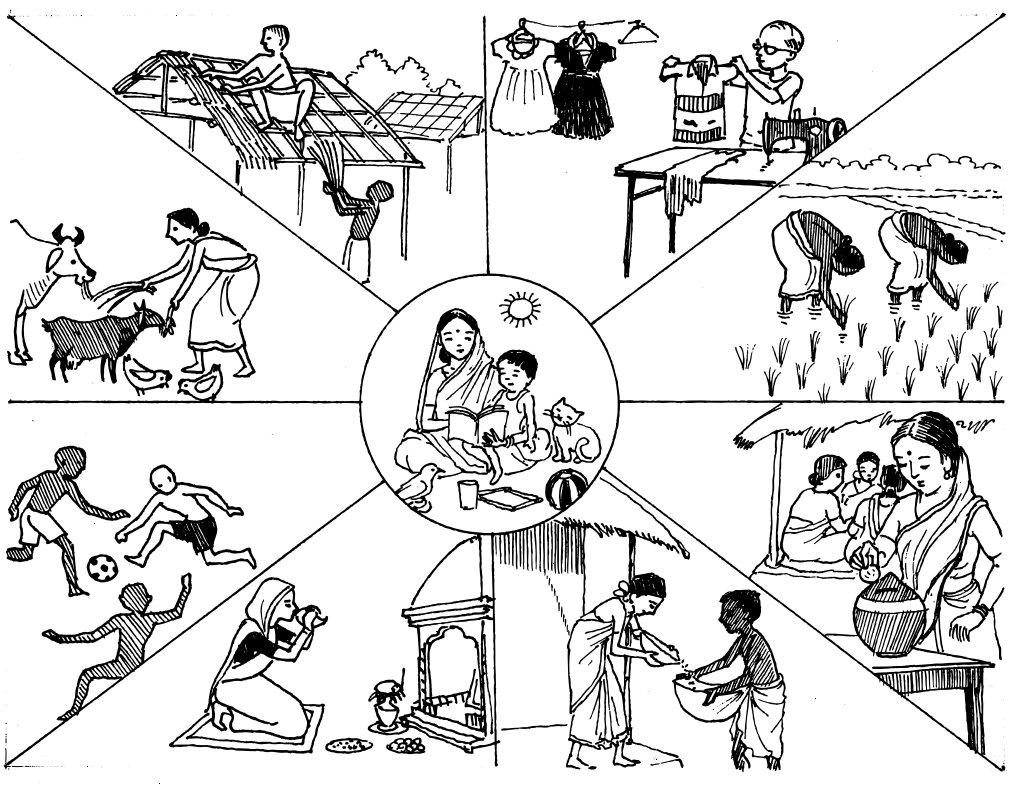

একটু অন্য চিন্তা ভাবনা শিক্ষাজগতে আনবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এমন এক বৃত্তিমূলক ও জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করা দরকার যা হবে দ্বিমুখী।এছাড়া এই ব্যবস্থা সংযুক্ত থাকবে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে, যা যুব সম্প্রদায় তথা সমগ্র সম্প্রদায়ের এমনভাবে ক্ষমতায়ন করবে যাতে তারা সক্ষম হবে অভাব, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের সম্মুখীন হতে। এক কথায় এই কাজটির মূল লক্ষ্য হোলো ভারতবর্ষের গ্রামীন অঞ্চলের দারিদ্র দূরীকরনের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষায় স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ।

জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখা (National curriculum framework) ২০০৫-এ নানান উৎসাহমূলক নীতির কথা বলা হয়েছে। যার মধ্যে এও বলা হয়েছে"...পাঠ্যসূচী পরিবর্তন এখনও প্রায় সব স্কুলে কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়। স্কুল শিক্ষা শিশুদের জীবনের উপযোগী করে তোলা প্রয়োজন। কার্যক্রম না কমিয়ে আরও বাড়ানোর প্রয়োজন। এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা দরকার যা বিশেষ করে (তবে কেবলমাত্র নয়) যুব সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় জীবন শৈলী শিক্ষাকে উন্নত করে।

যেভাবে এই কাজটা করার কথা নবদিশা ভেবেছে তা হোলো-

গ্রামীণ বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে শিশুদের ও তাদের অভিভাবকদের স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার, চাহিদা এবং উৎসাহের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় বৃত্তিমূলক ও জীবন শৈলী শিক্ষার বিষয়টি চিহ্নিতকরণ প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলিকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পাঠ্যসূচী/বিষয়বস্তু হিসাবে প্রচলন করা প্রয়োজনে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দক্ষতা তৈরির জন্য কর্মশালা অথবা পাশে থাকার ব্যবস্থা করা

শিক্ষাঙ্গনে স্থানীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের প্রাসঙ্গিকতা

নবদিশা উদ্যোগের একটি প্রধান স্তম্ভ হিসাবে গ্রামীণ – শিক্ষাঙ্গনে স্থানীয় প্রচলিত গ্রামীণ সংস্কৃতির চর্চা এবং প্রসার আজ খুব সামান্য পরিসরে হলেও বিদ্বজনদের একাংশের মধ্যে আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। যদিও চারিদিকে রাষ্ট্র মুখাপেক্ষী অধিকার ভাবনার ম-ম গন্ধ এই শান্ত – সুনিবিড় উদ্যোগকে সামনে আসতে দেয় না, তবু শুভ চিন্তা শুভ কর্ম পথে নির্ভয় যাত্রা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তা ডানা মেলবেই।

নবদিশার তাত্ত্বিক ভাবনায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিগুলির নিরন্তর চর্চা এবং সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে তাদের আরো সমৃদ্ধ করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবাহী অনুশীলন। আমরা গ্রামীণ শিক্ষাঙ্গনে শিশুদের স্থানীয় সংস্কৃতি প্রসঙ্গে নতুন চেতনায় অভিষিক্ত করি যাতে সে প্রকৃত সামাজিক মানুষ হিসেবে নিজেকে মেলে ধরতে পারে এবং বল্গাহীন অবক্ষয়ের মধ্যেও মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে তার গ্রামীণ – মানচিত্রে স্থায়ী ছাপ রাখতে পারে। তাই খুব ছোট পরিসরে হলেও এই কাজের পদ্ধতিগত প্রেক্ষিতে আমরা সাথে নিয়েছি স্থানীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে এবং এই পঞ্চায়েতের সাথে ও তার মাধ্যমে কাজ করা শুধুমাত্র প্রশাসনের মধ্য দিয়ে কিছু ন্যস্ত দায়িত্ব 'হাসিল' করে নেওয়ার জন্য নয়, বরঞ্চ আমাদের এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সামনে নিয়ে আসার মধ্যে নিহিত রয়েছে উন্নয়নের বিকল্প ধারার প্রেক্ষিতে স্থানীয় দরিদ্র মানবসত্তার জাগরণের প্রশ্নটি। এই জাগরণে মানুষের একমাত্র নির্বিকল্প প্রতিষ্ঠান হতে পারে পঞ্চায়েত।

এই ভাবনার মধ্য দিয়ে আমরা যখন 'নবদিশা' ভাবনার সম্প্রসারণ শুরু করি তখন এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি, যে স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশ এবং সংরক্ষণে পঞ্চায়েতকে সক্রিয় এবং তাৎপর্যমণ্ডিত ভাবে সামনে এগিয়ে আসতে হবে, তাই মাঠ-স্তরে আজ যে উদ্যোগগুলি বাংলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রবহমান, সেখানে নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলিতে শুরু করা হয়েছে এই অনুশীলনের কর্মকাণ্ড। এখানে নজর রাখা হয়েছে যাতে স্থানীয় মেধাবী অথচ বৃহত্তর প্রেক্ষিতে অপরিচিত মানুষেরা, যারা সাংস্কৃতিক অনুশীলনে লিপ্ত আছেন তাদের জন্য জায়গা যেন উন্মুক্ত থাকে। তাই ছৌ বা জারিগান যাই হোক না কেন আমরা শিশুদের প্রশিক্ষিত করে তুলছি এই সব ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে। যে পঞ্চায়েত হয়তো তার সমস্ত সুপ্ত সম্ভাবনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন সত্ত্বেও দূরে চলে গিয়ে ছিলো, তা আবার ফিরে আসছে নিজের মহিমায়। তাই আজ পলাশবনে নতুন ছৌ-প্রশিক্ষিত কিশোরের অনুশীলন দেখতে আসে গ্রাম সংসদের সদস্য। তিনি ভাবতেই পারেন না তার সংসদেই হয়তো তৈরী হচ্ছে নতুন কোনো বিশ্বমানের ছৌ-শিল্পী। শুধু তাই নয় যে কিশোর আজন্ম তার গ্রামে পঞ্চায়েত বলতে জেনে এসেছে অস্বচ্ছতা, সেও আজ উদ্বেল হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়েও শিক্ষকরাও তাদের কৈশোরে ফিরে যান ----- স্মৃতিতে ভাসে শান্ত গ্রামসমাজ, হেমন্তের ধানকাটা হয়ে যাওয়া মাঠ, অল্প কুয়াশা আর রাত্রি ব্যাপী মহাকাব্য।

'নবদিশা' বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যখন নাটক অনুশীলন করে, তখন আমরা চোখের সামনে দেখি অনাগত দিনের ছবি, যেখানে আমাদের শিশুরা মাতিয়ে দিচ্ছে শহরের এলিট কেন্দ্রগুলি, যে কেন্দ্রগুলি এতদিন ছিলো শুধু পেশাদার বৃন্দের দখলে, সেখানেই যখন এসে পড়ে আদিবাসী প্রান্তিক জনসমাজের নতুন প্রজন্মের শিশুদের প্রতিভার শান্ত কুচকাওয়াজ, তখন তাই হয় ওঠে আমাদের পুরস্কার। যে প্রতিভা হয়তো অবদমিত হয়ে ছিল পরীক্ষা আর সিলেবাসের চাপে, তাকে মুক্তি দিয়েছে পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগ। তাই আমরা বিশ্বাস রাখি এই সব শিশুরা যখন সামাজিক মানুষ হয়ে উঠবে তখন সে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শুধু প্রশাসন হিসেবে ভাববে না বরঞ্চ তাকে মনে করবে নিজস্ব মঞ্চ হিসেবে।

এর পাশাপাশি 'নবদিশা'র অনুপ্রেরনা পঞ্চায়েতকেও আরো নতুন অনুসন্ধানে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করছে। তাই যখন আমরা দেখি গ্রামের পুরোনো এবং এখন আর অনুশীলন-প্রদর্শন করতে না পারা লোকসংস্কৃতি চর্চাকারীদের খুঁজে বার করছে পঞ্চায়েত, আমরা তাকেই বলি যৌথ সাফল্য।

আমরা জানি নবদিশার আগামী দিনগুলি বন্ধুর এবং কঠিন। তবু সুচেতনা --- তুমি এক দূরতর দ্বীপ ----এই জীবনানন্দীয় অনুধ্যানে বিশ্বাস রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি সূর্যোদয়ের পথে।

শুধু চাকরির জন্য শিক্ষা নয় : স্যর কেন্ রবিনসন

(স্যার কেন রবিনসন শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য দীর্ঘদিন কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি শিক্ষাকে উদ্ভাবনী এবং সৃজনশীলতার প্রেক্ষিত হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। রবিনসন পৃথিবী বিখ্যাত একজন বক্তা বটে। কেন রবিনসন ২০০৬ সালে টেডএক্স সম্মেলনে চমৎকার বক্তৃতা দেন। যেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা চাকরি পাওয়ার জন্য করা হয়েছে। যা মোটেও ঠিক নয়। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন।

পাঠকদের জন্য টেডএক্স সম্মেলনে দেওয়া স্যার রবিনসনের বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ অনুবাদ করে দেওয়া হলো।)

আজকের আলোচনা তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে চলছে। আমি যা যা বলতে চাই তার সঙ্গে এই বিষয়গুলোর সম্পর্ক রয়েছে।

একটি হলো এখানে তোমাদের সবার ভেতরই সৃজনশীলতা আছে। এই সৃজনশীলতা নিয়েই আমি কথা বলতে চাই।

শিক্ষার ব্যাপারে আমার সবসময়ই আগ্রহ আছে। সত্যি কথা বলতে, আমি সবার মধ্যেই এই আগ্রহটা খুঁজে পাই। শিক্ষা বিষয়টাই অনেক আগ্রহের! তাই না?

আমাদের পড়ালেখা নিয়ে এতো আগ্রহের কারণ হচ্ছে এই পড়ালেখাই আমাদের এমন এক ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায় যা আমরা চিন্তাও করতে পারি না।

একটু ভেবে দেখো, এই বছরে যেসব শিশুরা স্কুলে যাওয়া শুরু করবে তারা ২০৬৫ সালে অবসর নেবে। কিন্তু তারপরও আমরা কেউ জানি না আগামী পাঁচ বছর পর এ পৃথিবীর অবস্থাটা কি হবে!

আমি মনে করি প্রতিটি শিশুর মধ্যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা আছে। আমি মনে করি সব বাচ্চারাই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। যদিও আমরা তাদের ভাবনাগুলোকে অনভিজ্ঞ বলে উড়িয়ে দেই। তাই আমি শিক্ষা সম্পর্কে এবং সৃজনশীলতা সম্পর্কে বলতে চাই। আমি বলতে চাই সৃজনশীলতাও স্বাক্ষরতার মতই গুরুত্বপুর্ণ।

কয়েকদিন আগে একটা গল্প শুনেছিলাম। যা আমি এখন প্রায়ই নানা জায়গায় বলি। ছয় বছরের এক মেয়ে ড্রয়িং ক্লাস করছে। ক্লাসের শিক্ষক দেখতে পেলেন মেয়েটি ক্লাসে একদমই মনোযোগ দিচ্ছে না। শিক্ষক মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি করছো? মেয়েটি বলল, আমি ঈশ্বরের ছবি আঁকছি। শিক্ষক অবাক হয়ে বলল, কিন্তু কেউই ঈশ্বরকে দেখেনি; এমনকি তুমিও না। মেয়েটির জবাব ছিল, হুম, কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই দেখতে পাবে।

শিশুদের তাদের সুযোগগুলো দিতে হবে। যদি বাচ্চারা না শেখে কোন কাজ কিভাবে করতে হবে; তবে তাদের ঝরে পড়তে হবে। খেয়াল করলে দেখা যাবে শুরুতে ভুল করার ব্যাপারে ওরা একদমই ভয় পায় না। আমি বলছি না ভুল করা এবং সৃজনশীলতা একই জিনিস। কিন্তু যদি ভুল করার ব্যাপারে প্রস্তুত না থাকি তাহলে কখনোই আমাদের মধ্যে আসল অনুভূতি জেগে উঠবে না।

ভুল যদি না করে কিংবা যদি শিশুদের ভুল করতে না দেওয়া হয় তবে বড় হয়ে তারা তাদের সৃজনশীলতার শক্তি হারিয়ে ফেলে। বড় হয়েও ভুল করার ব্যাপারে ভয় পায়। ভয়ের জন্য কোনো কাজেই মন দিতে পারে না।

আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এই পদ্ধতি দেখতে পাই। কোথাও ভুল করলে ক্ষমা নেই। ভুল করলেই চাকরি যাবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকেও আমরা নির্ভুল করে চালাতে চাই। শিক্ষার বিষয়ে ভুল করা মহা অপরাধের সমান।

এর ফলে অনেক বড় একটি ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি মানুষ শিক্ষিত হয় ঠিকই; কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় তার সৃজনশীলতা। পিকাসো বলেছিলেন, প্রতিটি শিশুই একজন শিল্পী। কিন্তু ওই শিশু বেড়ে উঠার সময়েই সেই শিল্পী সত্ত্বাটি অকেজো হয়ে পড়ে।

তোমরা যখন যুক্তরাষ্ট্র যাবে তখনই এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিন্নতা চোখে পড়বে। পৃথিবীর সব শিক্ষা ব্যবস্থাতেই অংক এবং ভাষা শিক্ষা থাকে। তারপর গুরুত্ব দেওয়া হয় শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে।

পৃথিবীর সব জায়গাতে একই অবস্থা। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগীত, নাটক এবং নৃত্যের থেকে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয় বিজ্ঞান, অংক, ভাষা ইত্যাদি বিষয়কে। পৃথিবীর কোথাও এমন কোন শিক্ষক নেই যিনি শিক্ষার্থীদের নেচে দেখান। কিন্তু কেন? আমি মনে করি অংক যেমন গুরুত্বপুর্ণ; ঠিক তেমনি নাচও গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চাদেরকে অনুমতি দিলে তারা সবসময়ই নাচতে থাকে। কতো সুন্দর লাগে তখন!

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের অধ্যাপক বানানোর জন্যই তৈরি হয়েছে।

এমনকি আমি নিজেও অধ্যাপকদের পছন্দ করি। শিক্ষকদের নিয়ে আমার নিজের একটা মতামত আছে। তারা সবসময় নিজেদের মধ্যেই বসবাস করে। সেটাও একটা নিজস্ব পরিবেশে। তারা নিজেদের শরীরকে তাদের মাথা বহনের জন্য ব্যবহার করেন।

এখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়। কারণ ছিলো ১৯ শতকের আগে পৃথিবীর কোথাও সার্বজনীন শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিলো না। তখন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা মেটাতেই এই ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

ফলে একটা বাচ্চা যা পছন্দ করে তাকে সেই বিষয়গুলো থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। যেমন তাদেরকে গান শিখতে মানা করা হয় কারণ কারো বাবা মা চায় না তাদের সন্তান সংগীত শিল্পী হোক। তাদের ছবি আঁকতে মানা করা হয় কারণ সমাজ চায় না কেউ চিত্রশিল্পী হোক।

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা যা আমাদের চিন্তাভাবনার গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। ফলে অত্যন্ত প্রতিভাবান, সৃজনশীল ব্যক্তিরা আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়। তাদের ভাবনার গতি বন্ধ হয়ে যায়। একসময় হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে তারা নিজেদেরকে সমাজের মধ্যে অকেজো ভাবতে শুরু করে।

তাই, আমি মনে করি না আমাদের এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

ইউনেস্কোর হিসেব অনুযায়ী আগামী ৩০ বছরে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি মানুষ স্নাতক সম্মান অর্জন করবে। এতে কী লাভটা হবে? এই শিক্ষিত মানুষগুলোকে দেখা যাবে বাড়িতে ভিডিওগেমস খেলছে। কারণ বাজারে চাকরি নেই।

আমি একটা বই নিয়ে কাজ করছি। বইটির নাম যীশুর আবির্ভাব যার মধ্যে আমি বিভিন্ন মানুষের প্রতিভা নিয়ে কয়েকটি সাক্ষাৎকার নিয়েছি। সেখানে গিলিয়ান নামে এক নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে আমার কথা হয়। তাকে প্রশ্ন করি, কিভাবে নৃত্যশিল্পী হলেন? উত্তরে সে আমাকে মজার গল্প শোনায়।

গিলিয়ান তার বাবা-মাকে নৃত্যশিল্পী হওয়ার ইচ্ছা জানায়। বাবা মা বিচলিত হয়ে ভাবতে থাকে গিলিয়ানের মধ্যে লার্নিং ডিজঅর্ডার আছে। তাই সে নৃত্যশিল্পী হতে চাইছে।

গিলিয়ানকে নিয়ে যাওয়া হয় ডাক্তারের কাছে। তার মা ডাক্তারকে সব সমস্যার কথা বলেন। ডাক্তার মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। পরে গিলিয়ানকে বাইরে যেতে বলেন। গিলিয়ান বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে ডাক্তার একটি গান ছেড়ে দেন।

এরপর গিলিয়ানের দিকে দুজনই তাকিয়ে থাকেন। ডাক্তার এবং গিলিয়ানের মা দুজনই বিস্ময়ের চোখে গিলিয়ানের নাচ দেখতে থাকেন। ডাক্তার তার মাকে বলেন, গিলিয়ান মোটেও অসুস্থ নয়। সে একজন শিল্পী। তাকে মিউজিক স্কুলে নিয়ে যান।

এরপরের কাহিনী বলার সময় গিলিয়ানকে স্মৃতিকাতর দেখায়। সে বলতে থাকে, আমাকে মিউজিক স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কেউই তার নিজের জায়গায় স্থির থাকে না। সবাই নাচে, গান গায়,আঁকে। সবাই সবকিছুই করে।

এখন আমি মনে করি আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নতুন একটি হিউম্যান ইকোলজিকে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের এই প্রজন্মকে তৈরি করতে হবে ভবিষ্যতের জন্য। যদিও আমরা হয়তো ভবিষ্যতকে দেখবো না, কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম দেখবে। তাই সেভাবেই আমাদের সৃজনশীলতাকে লালন-পালন এবং চর্চা করতে হবে। হয়তো এভাবেই একদিন পৃথিবী নতুন করে বেঁচে থাকার শক্তি পাবে। ধন্যবাদ।

বাংলাদেশের সংবাদপত্র প্রথম আলো-য় প্রকাশিত অনুবাদ

■■

গ্রামীণ – শিক্ষাঙ্গনে পুষ্টি বাগানের প্রাসঙ্গিকতা

'আমরা চাষ করি আনন্দে-----' এ শুধু সজল বাংলার তৃপ্ত কৃষকের উচ্চারণ নয় ------ এ আজ দিনহাটা অথবা কালচিনির শিশু কিশোরদেরও উচ্চারণ হতে পারে। নবদিশার ভাবনার ভুবনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুষ্টি বাগান একটি অনতিক্রম্য উপাদান। এই উপাদানের সঠিক পরিচালন, যত্ন এবং সম্প্রসারণ নবদিশা ভাবনার অন্যতম স্তম্ভ।

আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম একটি বাস্তুতন্ত্র-সম্মত বিদ্যালয়ের----- আমরা স্বপ্ন দেখি কৃষিমনস্ক একটি প্রজন্মের যে প্রজন্ম কৃষিকে একটি পেশা নয় ----- বরঞ্চ একটি সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি হিসেবে ভাবতে শিখতে। তাই বাস্তুতন্ত্র – পদ্ধতি মেনে সবজি – উৎপাদন করায় আমরা যত গুরুত্ব দিই তার থেকেও বেশী গুরুত্ব দিই শিশুর সাথে একটি লাউমাচার অদ্বৈত বন্ধনের ওপরে। যত প্রকৃতির সাথে দ্বৈতভাব থেকে শিশুর নবীকৃত উত্তরণ ঘটবে, তত সে হয়ে উঠবে পূর্ণ কৃষিমনস্ক সামাজিক মানুষ।

এই পুষ্টি বাগান ভাবনার সম্প্রসারণ পর্বে নবদিশার অন্যতম প্রধান সহযাত্রী হিসেবে সামনে এসেছে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি যারা 'নবদিশা'র মতাদর্শগত প্রেক্ষিত ভূমিতে অন্যতম প্রধান শরিক এবং গ্রামীণ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে তাদের ব্যবস্থাপক হিসেবে অধিকার সংবিধান-সম্মত ও সমাজ – স্বীকৃত।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উদ্যান – উদ্যোগের সম্প্রসারণ কোনো শৃঙ্খলিত উদ্যোগ নয়। বরঞ্চ এ হলো শিশু আর প্রকৃতির আনন্দ – যাপন। তাই আজ যখন দূর গ্রামের শিশুরা পূজোর পর থেকেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে রবিশস্যের আলোয় আলোকিত হওয়ার জন্য, যখন তারা নিজস্ব উদ্যোগে পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে আয়োজন করছে বেড়া, মাচা, তরল সার এবং কৃষির দেশীয় সরঞ্জাম আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা, সেই বীজের, তখন মনে হয়, বোধ হয় এরা রাষ্ট্র ভাবনার নয় বরঞ্চ সমাজের সন্তান।

নবদিশা খাদ্য সুরক্ষা, অধিকার ইত্যাদি চীৎকার-সর্বস্ব রাষ্ট্রীয় ভাবনার ওকালতি করে না। আমার সংসদ এলাকায় যা আছে তাই নিয়ে, কম ভোগে, কম আয়োজনে আমি বৃহত মানুষ হয়ে উঠবো। এই বোধের সঞ্চারে আমরা শিশুদের হাতে তুলে দিই বীজ, সার। এই শিশু যখন সামাজিক মানুষ হবে তখন সে, তথাকথিত অধিকার বাদে আপ্লুত হয়ে চাষের জল রাষ্ট্র দেবে, বীজ রাষ্ট্র দেবে, বিক্রির বন্দোবস্ত রাষ্ট্র করে দেবে ----- এরকম 'লড়াই' মার্কা ভাবনায় বৃথা কালক্ষেপ করবে না। কারণ ততোদিনে সে চিনে নিয়েছে নিজস্ব বীজ, বুঝেছে ভূ-গর্ভের জল কতদূর তুললে তা সুস্থায়ীত্বের ইঙ্গিত বহন করে, ততদিনে সে সুপরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবহার করতে শিখেছে ঘরের পাশের পতিত জমি, সে বুঝতে শিখেছে রাষ্ট্র মুখাপেক্ষী হয়ে নয়, বাঁচার ঠিকানা গ্রামের সমাজ – ভাবনার সম্প্রসারণে।

আমাদের বাগান – উদ্যোগের মধ্যে পুষ্টি ভাবনাও মিলে মিশে আছে। প্রাকৃতিক সহনসীমা লঙ্ঘন না করে চাষ করলে তবেই হতে পারে প্রকৃত পুষ্টি বাগান। তাই যখন রুক্ষ পুরুলিয়াতে একঘেয়ে মিড-ডে মিলের থালায় আসে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ নটে শাক --- তখন সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ সদস্য বা শিক্ষকদের মনে আশার সঞ্চার হয়। রাষ্ট্রের মিড-ডে মিলের বরাদ্দ তাকে শিশুকে স্বাস্থ্যবান করে তোলার সুযোগ দেয়নি, তাই বলে তিনি ভেঙে পড়েননি। বরঞ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে তুলে ধরেছেন সৃজনের পরম্পরা, তুলে ধরেছেন বিষের বলয় ছিন্ন করে প্রকৃতির নির্ভয় পথে যাত্রার অসীম সম্ভাবনা।

নবদিশার বাগান পালনের মধ্যে তাই যতটা না, না পাওয়ার রাগ থাকে তার থেকে বেশী থাকে সৃজনের আনন্দ। বাগান শিশুকে দেবে এমন এক শুদ্ধতা যেখানে প্রতিটি শিশু আগামীর শান্ত বিপ্লবী। এরা যখন বড় হবে যখন বুঝবে একটি তৃণ-খণ্ডে আছে বিপ্লবের সম্ভাবনা, তখনই আসবে নবদিশার আসল সার্থকতার মুহূর্ত। কারণ আমরা সফলতায় নয়, সার্থকতায় বিশ্বাসী।

■■

জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫'এর প্রেক্ষিতে স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থাগুলির সম্ভাব্য ভূমিকা

যদিও এখন পর্যন্ত শিক্ষার অঙ্গনে কর্মরত পেশাদার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির বয়ানে জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫ খুব একটি আলোচিত নথি হিসাবে উঠে আসেনি এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারী নথিগুলিতে খুব সাধারণ মানের ওষ্ঠ-পরিষেবা ছাড়া আর কিছু সেভাবে পাওয়াও যায় না, তবুও এই দলিলের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য এমনই সুগভীর, যে যারা শিক্ষার প্রথাসিদ্ধ অঙ্গনে নতুন সৃজনের পরিসর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, তাদের বিশেষ ভাবে উৎসাহ দিতে পারে এই জাতীয় স্তরের নীতি রূপরেখা।

শিক্ষাঙ্গনে নতুন ধারার অনুসন্ধানে নবদিশার সাবধানী সম্প্রসারণের প্রথম থেকেই আমরা এই রূপরেখার প্রতি উন্নয়ন কর্মীদের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করার দিকে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি। যেখানে যেখানে আমাদের নব-উদ্যোগের দর্শনবীজ রোপিত হয়েছে আমরা চেষ্টা করেছি এই নীতি রূপরেখার ধারনাতান্ত্রিক কাঠামোটিকে জনপ্রিয় বাচনে পরিণত করতে। আমাদের ভাবনার পরিসীমায় একদিকে যেমন থেকেছে মাঠ পর্যায়ে তার সম্প্রসারণের জন্য গ্রহণীয় কর্মসূচী প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট আলোচনা, আবার তেমন ভাবেই শিক্ষক, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের জন্য সংবিধান স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিত্বদের বৌদ্ধিক ভাবে প্রস্তুত করার জন্যও আমরা অনেকগুলি জরুরী এবং গুরুত্ব সম্বলিত কর্মসূচী নিয়েছি। এই নিবন্ধে আমরা দেখবো এই রূপরেখা কিভাবে পেশাদার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির জন্য দায়িত্ব এবং সম্ভাব্য অংশগ্রহণের সীমা নির্দেশ করেছে।

রূপরেখা স্বীকার করে নিয়েছে যে বিদ্যালয়ের নতুন আদর্শ সৃষ্টিতে, পাঠক্রমের উন্নতিতে, বিদ্যালয় এবং সম্পদ কেন্দ্রগুলিকে সাধারনের মধ্যে দৃশ্যমান জায়গা দিতে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির অতি গুরুত্বপূর্ন অবদান অনতিক্রম্য এবং এর ভিত্তিতে রূপরেখা খুব স্পষ্ট করে জানিয়েছে শিক্ষাঙ্গনের সৃজনী গভীরতা শুধুমাত্র ছাত্র অথবা শিক্ষকদের ওপরে নয়, বরঞ্চ নির্ভর করে পুরো ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত সমস্ত স্তরের মানুষদের জটিল মিথষ্ক্রিয়ার ওপরে এবং এই মিথষ্ক্রিয়া যত বেশী করে শিক্ষার মৌলিক ধারনাতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ হবে, তত আমরা প্রকৃত অর্থে এক পরিপূর্ণ জ্ঞান সমাজের পথে অগ্রসর হতে পারব। রূপরেখা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছে শিক্ষার কাজ চালানোর জন্য যেসব তথ্য এবং সহায়তা প্রয়োজন সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষন করার দিকে। এছাড়া জরুরী কর্তব্য হিসাবে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির চাপ-সৃষ্টিকারী ভূমিকা। SCERT, BRC, CRC র মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরো গণতান্ত্রিক, দায়বদ্ধ এবং পরিকল্পনা ও সৃজনী উদ্যোগের উৎসমুখ হিসেবে গড়ে তুলতে পেশাদার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা কমপ্লেক্সের ধারনা আমরা অনেক কাল ধরে শুনে আসছি। এপ্রসঙ্গেও রূপরেখা আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছে এই শিক্ষা কমপ্লেক্স আসলে বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় SCERT, DIET এবং পেশাদার উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগ। এই ধরনের উদ্যোগের গুরত্ব এবং তাৎপর্য নবদিশা –র পথিকরা যত সামনে নিয়ে আসতে পারবেন, তত নীতি স্তরে যেমন নতুন স্পন্দন সৃষ্টি হবে, তেমনই আমরা তৃণমূল স্তরে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সুসমন্বিত প্রতিষ্ঠানগত সাহচর্য পাবে।

রূপরেখা নতুন ধারার এবং আরো সৃজনশীল পাঠ্যপুস্তকের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেছে। এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাবে এবং ভাষায় রূপরেখা অতি সুস্পষ্ট ভাবে বলেছে প্রতিটি স্তরে এবং প্রত্যেক বিষয়ে একাধিক পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব খুব প্রয়োজনীয়। শুধু তাই নয় উপাদানের মধ্যে স্থানীয় প্রাসঙ্গিকতার ওপরে গুরুত্ব দিয়ে তার প্রাচুর্য্য সৃষ্টি করার ওপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে। এই কর্মকাণ্ডে সৃজনের প্লাবন সৃষ্টি করতে পারে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি। যদিও সুখের বিষয় সৃজনশীল পাঠ্য-উপাদান সৃষ্টি করার দিকে এই সব সংস্থাগুলি অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হত পেরেছে এবং প্রত্যন্ত অবস্থানে থাকা পরীক্ষা-মূলক বিদ্যালয়ের সীমায়িত পরিসরের সীমানা ছাড়িয়ে মূল ধারার বিদ্যালয়ে জায়গা করে নিচ্ছে এই সব পাঠ্য-উপাদান।

রূপরেখা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছে যে ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব এবং প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এবং আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন নতুন ধারার পরিকল্পনা গ্রহন করা যেতে পারে। এর সমান্তরালে রয়েছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শিশুদের পুষ্টির মান-উন্নয়ন ইত্যাদি।

নবদিশার সময়পর্বে এবং আগামী দিনেও এই নিয়ে আমাদের প্রচার-উদ্যোগ চলবে। সৃজনের নবধারাজলে শিক্ষাঙ্গনকে সিঞ্চিত করতে পথিকদের জরুরী নির্দেশিকা হিসেবে এই পাঠক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যারা সরাসরি শিক্ষাঙ্গনে উপস্থিত নেই, তাদেরও মতামত এবং আরো আগ্রহ বিস্তার অত্যন্ত জরুরী।

..... প্রথম পাতার পর

এক আদর্শ বিদ্যালয়ের পথে

পরিবেশমন্ত্রী তার সহযোগীদের নিয়ে প্রতিদিন স্কুল শুরুর আগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে এবং যেগুলি পচনশীল বস্তু সেগুলি "পচনশীল বস্তু"-র জন্য তৈরি করা আলাদা স্থানে নিয়ে জমা করে এবং যেগুলি অপচনশীল সেগুলি আলাদা স্থানে নিয়ে জমা করে। পরবর্তীতে পচনশীল বস্তু থেকে যে কম্পোষ্ট সার তৈরি হয় সেগুলি ব্যবহার হয় বিদ্যালয়ের সব্জীবাগানেই। খাদ্যমন্ত্রী ও তার সহযোগীরা প্রতিদিন ছাত্রগণনা করে মাস্টারমহাশয়দের সহায়তায় মিড ডে মিলের বোর্ডে বিশদ বিবরণ লিখে দেয় ও খাবার সময় নানা বিষয় দেখভাল করে – এইভাবে প্রত্যেক মন্ত্রী তার সভাসদদের নিয়ে যে যার দায়িত্ব পালন করে।

এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক – শিক্ষিকাগণ মনে করেন স্কুল শুধুমাত্র পড়াশুনা করার জায়গা নয়, স্কুল হল শিশুদের সার্বিক বিকাশের এক আশ্রম – এই ধারণা সামনে রেখে তারা শিশুমনকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যেখানে দেখা যায় মিড-ডে মিলের খাবার সময় ছোট ছোট ভাই বোনেরা যারা ঠিকমত খেতে পারছে না তাদেরকে উঁচু ক্লাসের দাদা দিদিরা মেখে খাইয়ে দিচ্ছে, হাত ধুইয়ে আনছে – সর্বোপরি এক পারস্পারিক সহমর্মিতা দেখা যাচ্ছে।

এর পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকাগণ তাদের উৎসাহ দিচ্ছে নানা সৃজনাত্মক কাজেও, তা সে বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি তৈরি হোক, স্কুল প্রাঙ্গণে গাছ লাগানো হোক, শরীরচর্চা হোক, কি সঙ্গীতশিক্ষা হোক, সব মিলিয়ে এ এক সৃজনের অমরাবতী।

মাস্টারমশাইদের ভাবনা হল ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে যে শুধু পাঠ্যপুস্তকের জন্য আসবে তা নয় তার সাথে সাথে এই ধরণের কাজগুলির জন্যও তারা ছুটে আসবে – তারা ভাববে আমরা নতুন একটা কিছু করতে পারছি, নতুন একটা কিছু জানতে পারছি – রোজ দিন, প্রত্যেক দিন। এখানেই থেমে নেই মাস্টারমশাইদের ভাবনা, তারা ভাবছে আরো নতুন কি করা যায় - এই প্রেরণা তারা পেয়েছে তার কারণ যেগুলি তারা একসময় ভেবে নিজেদের উদ্যোগে শুরু করেছিল যেমন শিশু সংসদ, নির্মল বিদ্যালয়, নির্মল পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়গুলি আজ সরকারী সার্কুলারেই আসছে।

ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক মহাশয় ও শিক্ষিকাগণদের কাছে এই স্কুল যেমন হয়ে উঠেছে তাদের নিজেদের ঘর, তেমনি অভিভাবকদের কাছেও এই স্কুল হয়ে উঠেছে যেন নিজেদের স্কুল। বড় রাস্তার পাশেই হওয়ার জন্য সব সময় থাকে এক দুর্ঘটনার আশঙ্কা। গ্রামের সাধারণ মানুষদের উদ্যোগে গ্রাম থেকেই যোগাড় হল বাঁশ, নিজেদের শ্রম দিয়ে তারা গড়ে তুলল স্কুলের সামনে এক বাঁশের বেড়া। এখানেই শেষ নয় স্কুলের যে কোন প্রয়োজনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তারা এক – কারণ তারা মনে করে এই স্কুল তাদের সন্তানদের আঁতুড়ঘর আর শুধু তাই নয় তারা আরো মনে করে এই স্কুল হল তাদের নিজেদের স্কুল, তাই তাদের সকলের মুখে শোনা যায় একটাই কথা "আমরাই গড়ি আমাদের স্কুল" ।

শ্রী মানিক সিংহ

..... প্রথম পাতার পর

এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার বার্তা

কোনওরকমে স্থানীয় যোগেশগঞ্জ হাইস্কুলে পড়াশুনা চালিয়ে গেলেও নবমী ও জ্যোৎস্নার অভাবের তাড়নায় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতেই পড়ার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। যোগেশগঞ্জ ও গোবিন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানা বরাবর বয়ে চলা, মজে যাওয়া গোমতি নদীর পাড়ে একফালি জায়গায় কনিকাদের অদম্য ও আন্তরিক পরিচর্যায় বেড়ে উঠছে ম্যানগ্রোভ নার্শারীর চারাগুলি। প্রথমবার বিফল হলেও ২য় বারের চেষ্টায় নরম হাতের পরম স্পর্শে চারাগুলি একটু একটু করে বড় হচ্ছে আর মলিন মুখের সোনালী হাসির সাথে লালিত হচ্ছে সোনালী স্বপ্ন। "বড়দের থেকে জেনেছি ও বইতে পড়েছি, ম্যানগ্রোভ গাছ নদীর ভাঙন তথা প্রাকৃতিক দূর্যোগ রোধ করে। তাই চারাগুলি নদীর ধারে লাগাবো আর পঞ্চায়েত যদি কিনে নেয়, তাহলে সেই টাকা দিয়ে বই খাতা কিনব আর কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমাবো"। ম্যানগ্রোভ পরিদর্শনে আসা বিভিন্ন লোকেদের কাছে একাধিকবার তাদের এই বাসনার কথাগুলি জানান কনিকা ও সুস্মিতা।

শুধু দক্ষিণ গোবিন্দকাটি নয়, উত্তর মালেকানা ও পূর্ব মালেকানা গ্রামের গরীব মহিলারা কার্যকরী দল গড়ে দু'জায়গায় ম্যানগ্রোভ নার্সারীতে বাইন, গর্জন, গোলপাতা, পশু, কাঁকড়া, সুন্দরী ইত্যাদি ৬০০০ চারা তৈরি করেছেন। সুন্দরবন বিশেষজ্ঞ সদ্য প্রয়াত ডঃ কুমুদ রঞ্জন নস্করের অনুপ্রেরণায় সুন্দরবনকে বাঁচানোর লক্ষ্যে ম্যানগ্রোভ নার্সারীর মাধ্যমে চারা তৈরির এই উদ্যোগ ইতিমধ্যে সব মহলে প্রশংসিত হচ্ছে। গোবিন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও উপ-প্রধান মাননীয় শ্রী অমল মণ্ডল ও মাননীয় শ্রী দেবরঞ্জন গায়েন জানিয়েছেন MGNREGS এর অধীনে নার্সারীতে তৈরি ম্যানগ্রোভ চারাগুলি উপকূল বরাবর নদীর ধারে রোপণ ও রক্ষনাবেক্ষনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, মাননীয় শ্রী তপন মণ্ডল এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে ব্লক স্তরে এই প্রবণতা ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। হিঙ্গলগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রাম দক্ষিণ গোবিন্দকাটি গ্রামের স্কুল ছাত্রী ও স্কুল ছুট কিশোরীদের তৈরি ম্যানগ্রোভ নার্সারীকে ঘিরে তাদের সোনালী স্বপ্নের উপর ভর করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ তথা সুন্দরবনকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার স্বপ্ন হয়ত একদিন সত্যি হয়ে উঠবে। আর তখনই এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার বার্তা ছড়িয়ে পড়বে হিঙ্গলগঞ্জ থেকে সমগ্র বিপদসঙ্কুল সুন্দরবন এলাকায়।

■■

বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা

নিকোলাই ফ্রিদরিক সেভেরিন গ্রুনউইগ

ডেনমার্কের একটি ছোট্ট গ্রাম। সেই গ্রামের গির্জার ধর্মযাজকমহাশয় আর পাঁচজনের থেকে অনেকটাই আলাদা। গির্জা সংলগ্ন তার যে বাড়ি তাঁর পড়ার ঘর থেকে তিনি প্রায় বের হন না। রাত দিন লিখে চলেছেন। কেবল উপাসনার সময় গির্জার প্রার্থনা ঘরে দর্শনারথিদের সামনে আসেন, এটুকুই যা। আর সে কি সব যুক্তিপূর্ণ, তার্কিক লেখা। লেখা গুলো ঝড় তুলত ধর্মীয় মহলে। খস্‌খসে রুক্ষ মেজাজের গ্রুনউইগ ছিলেন "দৈত্য কূলের প্রহ্লাদের" মতো। যাজক হলেও তাঁকে প্রচারকের দায়িত্ব দেওয়া হতো না, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিচালনার ভার পেতেন না। তার একমাত্র কারণ তাঁর "সৃষ্টি ছাড়া" ভাবনা-চিন্তা, ক্ষুরধার লেখনী। যা তখনকার ধার্মিক, রক্ষণশীল চিন্তাধারার বিপরীতে বইত। ওদের কাছে বড়ই অপ্রিয় ছিলেন তিনি। নিকোলাই এফ এস গ্রুনউইগ – ধর্মযাজক হয়েও তার কাজের বিস্তার ছিল নানা দিকে। ছিলেন শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, লেখক, কবি। বরং ছিলেন না ঈশ্বরতাত্ত্বিক। ধর্মযাজক বাবার ধার্মিক প্রভাব ছাপিয়ে নিকোলাইয়ের মনে বড় বেশি করে ছাপ ফেলেছিলো নর্ডিক পুরান কাহিনীগুলো, স্ক্যান্ডেনেভিয়ান লোক গল্প, চারণ কবিদের গান, বীরগাথা নিকোলাইকে টানত। নিজেও লিখেছেন প্রচুর স্তব – স্তোত্র – গান।

ছোট্ট নিকোলাই-এর ছেলেবেলা ঘিরে ছিল এক কথা-বলার জগৎ। একদিকে গল্প, আর কথামালা ওল্ড নর্স-এর লেখা পুরাণ কাহিনী, বীর গাথা আর অন্য দিকে ধর্ম প্রাণ , রক্ষণশীল বাবার ধর্মীয় উপদেশ। বড় হয়ে নিকোলাই সেই ছোট বেলায় শোনা ওল্ড নর্স মিথগুলি অনুবাদ করতে শুরু করেন। আর এত মনোগ্রাহী হয় সেই অনুবাদ যে তার জোরে রাজ অনুকূল্যের বরাত জুটে যায়। রাজার অনুদানে তিনি ইংল্যাণ্ড যান। দেখে আসেন ১৯ শতকের শিক্ষার পিঠস্থান – ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা। সেটা ছিল ১৮১২। এদিকে এলো ১৮৩০ সাল। গোটা ডেনমার্ক জুড়ে তখন পরিবর্তনের ঢেউ। রাজা সপ্তম চার্লস এর হাত ধরে গণতন্ত্র পা রাখছে ড্যানিশ রাজনীতির অলিন্দে। রাজা তৈরি করছেন মন্ত্রণা সভা যেখানে আপামর জন সাধারন মতামত দেওয়ার জন্য - শোনার জন্য যোগ দিচ্ছেন। এর আগে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে দেশে আইন পাশ হয়ে গেছে। প্রথম দিকে গ্রুনউইগের কাছে মন্ত্রণা সংসদে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের অধিকারটি তেমন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। ওনার মনে হয়েছিল গোটা ব্যাপারটাই অ-সার, মুখের কথা। পরে তিনিও বুঝতে পারেন যে সত্যি সত্যিই সমাজের নীচু স্তরের কথা শোনা হচ্ছে এই সংসদ গুলিতে। এটা বুঝে তার শিক্ষা সংক্রান্ত লেখা-পত্র যেন বেড়ে গেল। "মানুষের কণ্ঠ স্বর" তৈরি করতে হবে। এর জন্য চাই শিক্ষা। বস্তা-পচা লাতিন ভাষায় শিক্ষা নয়। চাই ডেনমার্কের মাতৃভাষায় শিক্ষা। যে শিক্ষা প্রাধান্য পাবে বচন – কথা বলা। যুগ যুগ ধরে যে কথা বলা – গল্প বলার ঐতিহ্য বয়ে চলেছে এ দেশ জুড়ে – সেই মৌলিক যোগাযোগের ভাষা -প্রাণভোমরা হয় এই শিক্ষা পাঠক্রমের। আর পাঠক্রমের আসল কুশীলবরা হবেন এক দিকে ড্যানিস চারণ কবিরা, আর অন্যদিকে পড়ুয়ারা হবেন সমাজের নানা স্তর থেকে, নানা বৃত্তি থেকে উঠে আসা নানা বয়সের সাধারণ মানুষ। গ্রুনউইগ-এর মতে এই স্কুলের আসল শিক্ষক হবেন চারণ কবি তা কেন ? তাঁর মতে চারণ কবিরা সাধারণ মানুষের আসল শিক্ষক। কারণ "তাদের গলার স্বরেই মিশে থাকে পিতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা জাগানোর, লালন পালনের ক্ষমতা, তাদের ভাষায় মধ্য দিয়ে মাতৃভাষা আরো শক্তিমান হয়ে ওঠে, ধনী হয়ে ওঠে।" এই ধরনের শিক্ষাক্রমে পুরাণকাহিনী বীর গাথা, ড্যানিস ছড়া, কবিতা গুরুত্ব পাবে।

কেমন হবে এর উপযোগী বিদ্যালয় ?

গ্রুনউইগ দাবি করলেন এক ফোক-হাই-স্কুল বা লোক-বিদ্যালয় তৈরি করার জন্য। কেমন সে স্কুল ? গ্রুনউইগ লিখলেন কখনই সেই স্কুল লাতিন – গ্রামার স্কুল নয়। ও গুলো যেন এক একটা "মৃত্যুপুরী"। গ্রুনউইগ দাবি করলেন "জীবনের জন্য স্কুল" বা "ফোক-হাই-স্কুল"। যেখানে ঘটবে প্রানের সঙ্গে প্রানের আদান – প্রদান, জীবনের সঙ্গে জীবনের মেল বন্ধন। শিক্ষক আর পড়ুয়ারা হবে একে অপরের সাথী, সহচর। আবাসিক হবে এই স্কুল। এই স্কুলে যা পড়ানো হবে তার সঙ্গে থাকবে জীবনের যোগ। নিজেদের চেনা জানা জগতকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে শিক্ষক আর পড়ুয়ারা ক্লাস ঘরে হবে আদান-প্রদান। আরো জানা-শেখা-বোঝা। তারপর পড়া শেষ করে এক এক করে যখন তারা ফিরে যাব নিজেদের চেনা পরিবেশে, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে অর্জিত জ্ঞান। ব্যক্তি মানুষটি বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে সমাজ-সংসার বিকশিত হবে। এ যেন লাতিন-গ্রামার স্কুল ধারার একদম বিপরীত ধারা। এখানে থাকবে না বইপত্রের সমাবেশ, না থাকবে পরীক্ষা ব্যবস্থা। এই স্কুল বাস্তবে রূপ দেবে যীশু খৃষ্টের "Living Word" বা "জীয়ন্ত শব্দ" কে।

অন্তীম ভোজনে বসেছেন যীশু সঙ্গে রয়েছে তাঁর ১২ জন শিষ্য যারা এসেছেন সমাজের নানান স্তর থেকে। যীশু আর শিষ্যরা – শিক্ষক আর তাঁর ছাত্রদল। রুটি খেতে খেতে আর সুরা পান করতে করতে চলছে কথা। "জীয়ন্ত শব্দ" "Living Word" - Phrase টি যীশু ব্যবহার করেছিলেন সেদিন। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি নিঃশব্দ ছিল না। এখানে কথা বলা হচ্ছিল। যীশু বলছেন চির সত্যের কথা। বাকিরা শুনছেন – সাড়া দিচ্ছেন। যীশুর কথাগুলো মৃত শব্দ ছিল না। এদের মধ্যে প্রাণ ছিল – যীশুর প্রাণ মিশেছিল। শক্তিমান শব্দ, সক্ষমতার শব্দ যীশুর মুখ থেকে ঝরে পড়ছিল আর সেই শব্দগুলো শিষ্য – শ্রোতাদের মনে সক্রিয় সাড়া জাগাচ্ছিল। ধর্মযাজক গ্রুনউইগ Last Supper -এর এই ঝরে পড়া দেখতে পেয়েছিলেন, তার স্বপ্নের লোক বিদ্যালয়ের ক্লাস ঘরে। যা ক্লাস কক্ষ ছাড়িয়ে বাইরের বৃহত্তর জগতের ছড়িয়ে পড়বে – ফোক হাই স্কুলের পড়ুয়াদের মাধ্যমে। গ্রুনইউ-গের ফোক হাই স্কুল সংক্রান্ত ধারনা প্রথম প্রকাশ পায় ১৮৩২ সালে। তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন নর্ডিক পুরাণচর্চায়। তিনি লিখলেন "নর্ডিক মিথলজি (নর্ডেনস্ মাইথোলজি)" নামক বইটি। আর এই বইয়ের ভুমিকায় প্রথম দেখা যায় ভবিষ্যতে লোক-বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান ধারনা। গ্রুনউইগ ফোক হাই স্কুলের প্রবক্তা হলেও তিনি এই স্কুল স্থাপন করেননি। জীবনের মধ্য ভাগে তিনি ভারটোভ গির্জার বিশপ নিযুক্ত হন। আর এই গির্জার পড়ার ঘর থেকে লোক-স্কুলের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা ডেনমার্ক জুড়ে। ১৮৪৪ – এ প্রথম ফোক স্কুলটি রডিং –এ তৈরি হয়। গ্রুনউইগের সুযোগ্য শিষ্য ক্রীস্টেন কোল্ড নিজের স্কুলটি স্থাপন করে লোক-স্কুল আন্দোলনের সূচনা করেন। গ্রুনউইগ কিন্তু তার পড়ার ঘর আর লেখার টেবিলের চৌহদ্দি ছেড়ে বেরোতেন না। একমাত্র গির্জার অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা যেত। অদ্ভূত ব্যাপার তাঁর চিন্তা ধারায় তৈরি হওয়া স্কুলগুলিকেও দেখতে যেতেন না। কোল্ডই আসতেন তাঁর কাছে মুশকিল আসানের পথ খুঁজতে। ১৮৬৪ সাল ইতিমধ্যে সারা ডেনমার্ক জুড়ে তৈরি হয়ে গেছে ১৫ টি ফোক হাই স্কুল। ডেনমার্ক জড়িয়ে পড়ল যুদ্ধে আর প্রুশিয়ান-অস্ট্রিয়ান সৈন্যদলের কাছে হেরে গেল ডেনমার্ক। এরপর হল জামার্নির সঙ্গে যুদ্ধ। সেই যুদ্ধেও ডেনমার্ক পরাজিত হল। ডেনমার্কের প্রথম ফোক হাই স্কুল ছিল রডিং -এ। সেই রডিং চলে গেল জামার্নির দখলে। পরাজিত ডেনমার্কের একদম উত্তর সীমান্তে অ্যাসকভে। যেহেতু জার্মান সীমানার কাছে, তাই অ্যাসকভে স্কুলটিতে ড্যানিশ সংস্কৃতি চর্চার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল।

অ্যাসকভের স্কুলটিকে সামনে রেখে এরকম আরো স্কুল তৈরি হল সারা ডেনমার্ক জুড়ে। ফোক হাই স্কুলের সেটা ছিল স্বর্ণ যুগ। ফোক হাই স্কুলের মাধ্যমে পড়ুয়ারা জানবে তার "পিতৃভূমির কথা, দেশের মানুষের কথা, মাতৃভাষার কথা, দেশের রাজার কথা" – এই ছিল গ্রুনউইগের বাসনা। তিনি বলেছেন এমন এক লোক জীবনের কথা যা আর সবাইকে কাছে টেনে নেয়। এই লোক জীবন চর্চা করার অর্থ দেশের মানুষের পরিচিতির স্বীকৃতি দেওয়া, সংরক্ষণ করা দেশের মানুষের সাহিত্য, কবিতা ও জীবনচর্চাকে স্বীকৃতি দেওয়া। আপাত ভাবে উগ্র-জাতীয়তাবাদী মনে হলেও, গ্রুনউইগের লেখা ভালো করে বুঝে দেখলে দেখা যাবে যে তিনি আদতে ছিলেন একজন বিশ্ববাসী ও জীবনবাদী মানুষ। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় ছিল তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাঁর প্রবর্তিত ফোক হাই স্কুল উৎখাত হওয়া মানুষজনের মনে নিরাপত্তা বোধ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। ফোক হাই স্কুলের আন্তরিক, অত্যন্ত আপন, চেনা-জানা পাঠক্রম বহু বহু সাধারন খেত খামারের খাটা ড্যানিশ চাষিকে স্কুল শেষ করে নিজেদের জানাশোনাকে আরো বিকশিত করে নিজেদের জীবিকায় ফিরে যেতে সাহায্য করে ছিল। শিক্ষিত হয়েও তারা তাদের জীবিকাচ্যুত হননি। গ্রাম ও কৃষি-ভিত্তিক জীবিকা ও অর্থনীতিকে এই স্কুল আন্দোলন আরো উজ্জীবিত করেছিল। সময়ের সঙ্গে ড্যানিশ সমাজে পরিবর্ত্তন এসেছে। কৃষি থেকে ক্রমে এ দেশ শিল্প নির্ভর হয়ে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে ফোক হাই স্কুলগুলিও তাদের চরিত্র বদলেছে। ভাবা হয়েছিল গ্রুনউইগের ফোক স্কুল হয়তো ২০ শতকের আলো দেখবে না। শত্রুর আশায় ছাই দিয়ে ডেনমার্ক জুড়ে ফোক হাই স্কুল আরো আরো তৈরি হয়েছে। সেটা ১৯৮০ সালেও। সাম্প্রতিক কালেও এর প্রসার দেখা যায়। পাশাপাশি সুইডেন, নরওয়ে, ফিন-ল্যাণ্ড ও জার্মানি, পোল্যাণ্ডেও ফোক স্কুলের ঢেউ গিয়ে পড়ছে।

গ্রুনউইগ চেয়ে ছিলেন স্বল্প মেয়াদের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। যেখানে "মৃত জ্ঞানকে" প্রতিস্থাপিত করবে জীবন। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সরিয়ে জায়গা করে নেবে জীবনমুখী "অন্য আর এক রকম ব্যবস্থা।" এই স্বপ্ন পূরনের জন্য আমাদের তাকিয়ে থাকতে হবে – ভবিষ্যতের দিকে।

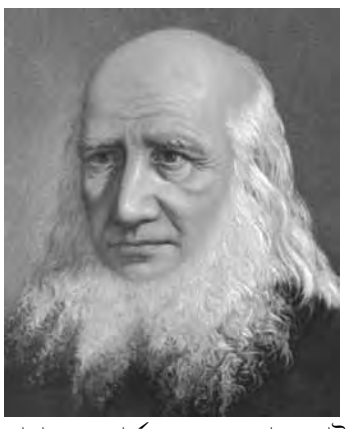

Rodding Højskole, ১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ডেনমার্ক প্রাচীনতম লোক উচ্চ বিদ্যালয়

গ্রুনউইগ **লোক উচ্চ বিদ্যালয়**

ডেনমার্কে ঊনবিংশ শতকে গ্রুনউইগ এবং কোল্ডের অষ্টাঙ্গ পথে শিক্ষা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্রুনউইগ এবং কোল্ড মুক্ত স্কুল ব্যবস্থার স্বপক্ষে নিম্নোক্ত আটটি যুক্তি দেখিয়েছিলেনঃ-

১। শিশুদের জন্য স্কুল হওয়া উচিৎ বাড়ীর-ই অতিরিক্ত অংশ
২। স্কুল শিশুদের উপকারের জন্যই তৈরী হয়েছে। শিক্ষণ পদ্ধতি তাই শিশুদের দক্ষতা এবং চাওয়া অনুযায়ী তৈরী হওয়া উচিৎ
৩। হাত হচ্ছে মনের ধারক
৪। শিখতে শেখা
৫। প্রচলিত কথা ও গল্প বলা – সকালের জমায়েত
৬। সংঘবদ্ধভাবে থাকার স্বাধীনতা
৭। শিক্ষার স্বাধীনতা
৮। গনতান্ত্রিক স্কুল

১। স্কুলগুলি হওয়া উচিৎ আরেকটি বাড়ীর মতো। পড়ানো ছাড়াও তাদেরকে এমন ভাবে বড় করে তুলতে হবে, যাতে তারা হয়ে উঠবে নমনীয়, সামাজিক, যারা নিজেদের জানবে, অন্যদের সম্মান করবে এবং নিজেদের দক্ষতাকে সাধারন সমাজে ব্যবহার করবে। স্কুল তথা শিক্ষকরা শিশুদের যত্ন নেবেন, আত্মবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরী করবেন, এবং সর্বোপরি মানবিকতার সাথে এবং সক্রিয়ভাবে শিশুদের মাঝে উপস্থিত থাকবেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রাথমিক কারন হচ্ছে শিক্ষক এবং বাবা-মায়েদের একটা সাধারন বোঝাপড়ার জায়গা থেকে কাজ করা দরকার। স্কুলগুলিকেই এটা সংগঠিত করতে হবে এবং এটা নিশ্চিত করতে হবে যে শিশুরা সারা বছর ধরে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, যদিও শিশু, বাবা-মা এবং শিক্ষকদের মধ্যেকার সম্পর্ক কোন সাম্যের সম্পর্ক নয়, এটার ভিত্তি সমান মর্যাদার।

২। প্রত্যেকটি শিশুকে তার নিজস্বতা অনুযায়ী দেখা উচিৎ। শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যেকটি শিশুকে আলাদা করে বোঝা অর্থাৎ সে কি ভাবছে, পৃথিবীকে সে কি চোখে দেখে বা যে কোন বাধা অতিক্রম করার বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি। বলা যেতে পারে, যে কোন শিক্ষকের উচিৎ প্রত্যেকটি শিশুর সামনে নত হওয়া, যাতে শিক্ষা শুরু হওয়ার আগে যে কোন শিশু যেন তার শিক্ষকের ভিতরের মনুষ্যত্বকে উপলব্ধি করতে পারে। শিক্ষা প্রত্যেকটি শিশুর দক্ষতা এবং প্রত্যাশা অনুযায়ী হওয়া উচিৎ। বর্তমানে বিষয়ের মান একটা শ্রেণীকক্ষের ভিতর শিশু অনুযায়ী মানানসই হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের শেখানোর পদ্ধতিও কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিৎ। অনেক ধরনের বুদ্ধিমত্তার কথা জানা থাকলে ক্লাসঘরকে উপযুক্তভাবে সাজান সম্ভব।

৩। গ্রুনউইগ এবং কোল্ড বিশ্বাস করতেন যে শিশুরা পৃথিবীতে ভুল করে শেখার পদ্ধতিতেই গ্রহণ করে। তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ তাদের মস্তিস্কের কার্যকলাপের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত, যা আবার আগামী দিনের আরও শিক্ষাগত কাজকর্মের ভিত্তি।

৪। স্কুল জীবনের ফল এবং শিক্ষকদের প্রচেষ্টা স্কুলের পদমর্যাদায় বা পরীক্ষার নম্বরে দেখা যায় না। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ফলাফল হচ্ছে জীবনের প্রতি ধারনা এবং শিক্ষা, যা একজন ছাত্রছাত্রী যখন তার স্কুল শেষ করে তখন তার ব্যক্তিত্বের সাথে গড়ে ওঠে। আজকের শিশুরা এক অর্থে

এই পৃথিবীর অধিবাসী, যা আমরা বড়রা জানিনা। এটা দাবী করে আত্মসচেতনতা, সাংস্কৃতিক সচেতনতা, এবং এক মুক্ত ও অনুসন্ধিৎসু মতামত যা অন্যদিকে প্রচলিত। স্কুলগুলি সেজন্য প্রতিনিয়ত বিশ্বনাগরিত্বের এই ভাবনার প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। তাই উচিৎ সারাদিন পৃথিবীতে যা চলছে সেদিকে নজর রেখেই তাদের তৈরী করা।

৫। আমাদের চারিদিকের প্রায় সমস্ত স্কুলগুলিই শুরু হয় সকালের প্রার্থনা দিয়ে, যেখানে তারা একসাথে গান গায়, একসাথে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা জানায়। এছাড়াও তাদের নির্দিষ্ট সময় আছে গল্প বলার। প্রচলিত কথা, রূপকথা, উপন্যাস, শিক্ষকদের ভ্রমণকাহিনী, পুরাকাহিনী ইত্যাদি তাদের শোনার ক্ষমতাকে বাড়ায়, নিজেকে চেনায়, এবং সমাজের প্রচলিত জ্ঞান ও ভাষার উপর দক্ষতা বাড়ায়।

৬। দুটি জিনিষ সমান গুরুত্বপুর্ণঃ বন্ধুত্ব এবং স্বাধীনতা। মুক্ত স্কুলের কথা বললেই এই দুটো জিনিষ পরপর আসে, কারন স্কুল পরিবেশের ভিত্তিই হচ্ছে বন্ধুত্ব। স্কুলের সাথে সংযুক্ত সবার মধ্যে এক না হয়েও গভীর বন্ধুত্ব গড়ে তোলাই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য, কারন ব্যক্তির মধ্যকার স্বাতন্ত্রকে বন্ধুত্বের শক্তি হিসাবে দেখা হয়। এখনও পর্যন্ত প্রত্যেককে ততটাই করতে বলা হয়েছে যতটা তাদের নিজেদের এবং অন্যের বাচ্চাদের জন্য করা সম্ভব। এর কারন প্রত্যেকের পক্ষে একই রকম করা সম্ভব নয়, কারন তাদের অবস্থাও এক নয়।

৭। শিক্ষা হচ্ছে সমস্ত মানবিক আদান-প্রদানের মধ্যে একমাত্র স্বাধীন বিষয়, এটা তখনই সার্থক হবে যখন সমস্ত অংশগ্রহণকারীরা স্বেচ্ছায় এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করবে। যারা কাজ করে তারাও শিখবে।

৮। স্কুলগুলির ভিত্তি হচ্ছে পুরোন কিন্তু শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ধারনা। এই গণতান্ত্রিক ধারনার মূল বিষয় হল সংখ্যাগরিষ্টরা যেন সংখ্যা লঘিষ্ট যারা তাদের বিষয়টা যতটা বেশী সম্ভব খেয়াল রাখে। যদি এটাই সত্য হয় যে সংখ্যাগরিষ্টের মতটাই আসল সত্য তাহলে তার প্রয়োজন নেই কারন আজকের দিনে সামগ্রিক সত্যের ধারনাটাই কাল্পনিক, এবং গণতন্ত্রের শক্তিই হচ্ছে সংখ্যা লঘিষ্টের মতকে গুরুত্ব দেওয়া।

স্কুল পরিবেশের সামগ্রিক ছবির মধ্যে, স্কুল এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে মুক্ত স্কুলের ধারনায় দেখা যাচ্ছে, এখানে প্রত্যেকের কথা শোনা হয় এবং প্রত্যেকের কিছু না কিছু পালনীয় ভূমিকা থাকে। ■■

বহুমুখী শিক্ষা কি ?

বনের কতিপয় জন্তু একটি স্কুল খুলতে মনস্থ করল। স্কুলে ছাত্র হিসেবে এল একটি পাখি, একটি কাঠবেড়ালী, একটি কুকুর, একটি খরগোস এবং একটি মানসিক প্রতিবন্ধী, এবং সব ছাত্রকেই সব বিষয় নিতে হবে। শিক্ষাসূচীর মধ্যে ছিল আকাশে ওড়া, গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, মাটি খোড়া ইত্যাদি ।

পাখি ভালো উড়তে পারে বলে ওড়াতে সে প্রথম; কিন্তু মাটি খুঁড়তে গিয়ে তার ঠোঁট গেল ভেঙ্গে, ডানা গেল মুচড়ে। ফলে ওড়াতেও তার দক্ষতা কমে গেল। সব মিলিয়ে সে পেল তৃতীয় শ্রেণী।

কাঠবেড়ালি গাছে চড়াতে সব সময়েই প্রথম, কিন্তু সাঁতারে ফেল, কুকুর স্কুলে ভর্তি হলো না, স্কুলের জন্য চাঁদাও দিল না। উল্টে "ঘেউ ঘেউ করা" কে পাঠ্যতালিকায় স্থান দেওয়ার দাবিতে পরিচালক মন্ডলীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করল।

মাটি খোঁড়াতে খরগোস প্রথম, কিন্তু গাছে চড়া তার কাছে সমস্যা। কয়েকবার চড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে মস্তিষ্কে আঘাত পাওয়ার ফলে সে মাটি খোঁড়াও ভালো করে করতে পারছিল না। ফলে সব মিলে সে পেল তৃতীয় শ্রেণী।

এদিকে মানসিক প্রতিবন্ধী সব বিষয়েই মাঝারি। ফলে সব বিষয় মিলিয়ে সেই হলো প্রথম! পরিচালক মন্ডলী খুশি কারণ একটি বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যেক ছাত্র ব্যাপক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা পেয়েছে।

কিন্তু বহুমুখী শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হোল ছাত্রদের যে যে বিষয়ে দক্ষতা আছে এবং স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রবণতা আছে তাকে ক্ষুন্ন না করে সেই বিষয়ের দক্ষতাকে আরও উন্নত করে জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা।

আমাদের সকলেরই কোনও না কোনও বিষয়ে দক্ষতা আছে, যেমন, হামিংবার্ড খুব ছোট্ট পাখি, এক আউন্সের দশভাগের একভাগ মাত্র ওজন। কিন্তু দেহ এত নমনীয় যে সে খুব জটিল ভাবে প্রতি সেকেন্ডে ৭৫বার পাখা সঞ্চালন করতে পারে। ফলে হামিংবার্ড ফুলের উপর উড়ে উড়ে মধু পান করতে পারে কিন্তু সোজা আকাশে উড়তে বা বাতাসে ভেসে বেড়াতে কিংবা লাফিয়ে লাফিয়ে মাটির উপর বেড়াতে পারে না।

৩০০পাউন্ড ওজনের উটপাখি পাখিদের মধ্যে বৃহত্তম; কিন্তু উড়তে পারে না। কিন্তু এদের পা এত শক্ত যে ঘন্টায় ৫০ মাইল বেগে দৌড়াতে পারে; এক পদক্ষেপে ১২থেকে ১৫ফুট যায়। ফলে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকেই দক্ষ তাদের নিজস্ব ক্ষমতায়।

■■

নবদিশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবি রায় কর্তৃক ৫/১/২/জি কর্ণফিল্ড রোড, কলিকাতা – ৭০০০১৯ হইতে প্রকাশিত ও শান্তি মূদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY